চলো কলকাতা

বিমল মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা ৯

....India ought not to take American money for her national movement and must raise her own money. I shall go to America only when India is independent and speak of India and Indian culture without taking money for my lectures.

Mahatma Gandhi

(from a letter written to Sri Sotu Sen)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাই যে, গত কয়েক বছর যাবৎ অসংখ্য উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ও-গুলি এক অসাধু জুয়াচোরের কাণ্ড। আমার লেখার জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বহু লোক ওই নামে পুস্তক প্রকাশ করে আমর পাঠকবর্গকে প্রতারণা করছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

বিমল মিত্র

উৎসর্গ

শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার সাহস, সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা ও সততার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে এই 'চলো কলকাতা' আপনার হাতেই উৎসর্গ করলাম।

এই লেখকের এ-যাবৎ লেখা বইয়ের সম্পূর্ণ তালিকা

এর নাম সংসার
চার চোখের খেলা
সাহেব বিবি গোলাম
সাহেব বিবি গোলাম (নাটক)
একক দশক শতক
একক দশক শতক (নাটক)
কড়ি দিয়ে কিনলাম
বেগম মেরী বিশ্বাস
শ্রেষ্ঠ গল্প
সখী সমাচার
সাহিত্য বিচিত্রা
মিথুন লগ্ন
নফর সংকীর্তন
ও হেনরির গল্প (অনুবাদ)
ইয়ার্লিং (অনুবাদ)
মন কেমন করে
অন্যরূপ
নিশিপালন
রাজা বদল
কন্যাপক্ষ
সরস্বতীয়া
বরনারী (জাবালি)
চলো কলকাতা
বেনারসী
কুমারী ব্রত
আমি
রাগ ভৈরব
আসামী হাজির
দু চোখের বালাই
পরস্ত্রী
যা হয়েছিল
মধ্যিখানে নদী
যে অঙ্ক মেলেনি
তিন নম্বর সাক্ষী
চলতে চলতে
কলকাতা থেকে বলছি
গল্পসম্ভার
গুলমোহর
রানী সাহেবা
কথাচরিত মানস
কাহিনী সপ্তক
এক রাজার ছয় রানী
প্রথম পুরুষ
মৃত্যুহীন প্রাণ
টক ঝাল মিষ্টি
পুতুল দিদি
মনে রইলো
হাতে রইলো তিন
দিনের পর দিন
শনি রাজা রাহু মন্ত্রী
তোমরা দু'জন মিলে
তিন ছয় নয়
নিবেদন ইতি
প্রেম, পরিণয় ইত্যাদি
রং বদলায়
সুয়োরানী
নবাবী আমল
নটনী
স্ত্রী
বিনিদ্র
কেউ নায়ক কেউ নায়িকা
যে যেমন
চাঁদের দাম এক পয়সা
ফুল ফুটুক
লজ্জাহরণ
পাঁচ কন্যার পাঁচালি
আমার প্রিয়
বাহার
বিষয় বিষ নয়
জন-গণ-মন
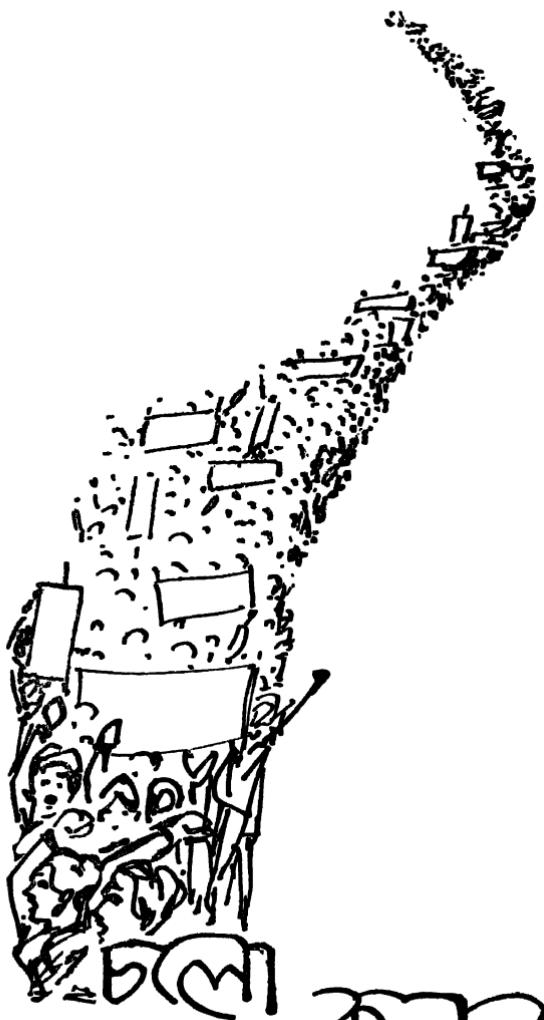
চলো কলকাতা

চলো, কলকাতা চলো।

চলো, চলো, কলকাতা চলো!

আদিযুগে লোকে কলকাতায় আসতো অন্য কারণে। তখন কলকাতা মানেই ছিল কালীক্ষেত্র। এই কালীক্ষেত্রের কালীদেবী প্রথমে ছিল পাথুরিয়াঘাটাতে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লেখা আছে—

"ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান দুইকুলে বসাইয়া বাট।
পাষাণে রচিত ঘাট, দুকুলে যাত্রীর নাট, কিঙ্করে বসায় নানা হাট॥"

পাষাণে রচিত ঘাট মানেই পাথুরিয়াঘাট। তখনকার দিনে এখনকার স্ট্র্যাণ্ড রোড ছিল গঙ্গার জলের তলায়। কবিকঙ্কণ তাঁর চণ্ডীতে ওই ঘাটের কথাই উল্লেখ করেছেন। দরমাহাটা স্ট্রীটে ঠিক পান্‌পোস্তার উত্তর দিকে দেবীর মন্দির ছিল। সেখান থেকে কাপালিকেরা দেবীকে আরো নির্জন জায়গা খুঁজে কালি-ঘাটে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করে। তখনকার দিনে কাপালিকদের সবাই ভয় করতো। তারা মন্দিরের দেবীর সামনে নরবলি দিত। কারো ক্ষমতা ছিল না তার প্রতিবাদ করে। নরবলি না দিলে কাপালিকদের পুজো নিয়ম-সিদ্ধ হতো না, কাপালিকদের সাধনা পূর্ণাঙ্গ হতো না।

এখন আর সে-যুগ নেই। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। কলকাতাতে আর কাপালিক নেই। শুধু কলকাতা কেন, সারা বাঙলা-দেশ খুঁজলেও আর একটা কাপালিককে দেখতে পাওয়া যাবে না। তাদের অস্তিত্ব চিরকালের মত বিলুপ্ত হয়ে গেছে কলকাতার বুক থেকে।

কিন্তু না, আসলে সেই সে-যুগের সব কিছুই আছে। কিছুই বদলায়নি। সেই কালীক্ষেত্রও আছে, সেই কালী দেবীও আছে, সেই কাপালিকও আছে। কালীক্ষেত্রের কাপালিকেরা আজও ঠিক তেমনি করেই মন্দিরের দেবীর সামনে নরবলি দেয়। তেমনি করেই কাপালিকেরা নরবলি দিয়ে তাদের পুজো নিয়ম-সিদ্ধ করে। তাদের সাধনা পূর্ণাঙ্গ করে। শুধু তাদের বাইরের পোষাক বদলেছে, তাদের নাম বদলেছে।

আর যাত্রীরা?

আগে যাত্রীরা আসতো আশেপাশের জনপদ থেকে। আসতো অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ থেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। আর এখন যাত্রীরা আসে ইংলণ্ড থেকে, রাশিয়া থেকে, আমেরিকা থেকে। সব যাত্রীরাই আসে কলকাতায়। কলকাতায় না এলে বুঝি কারোর চলে না। এখানে না এলে বুঝি কারো পুজো নিয়ম-সিদ্ধ হয় না, কারো সাধনা পূর্ণাঙ্গ হয় না।

আর আশ্চর্য, আজও এই কলকাতার কালীক্ষেত্রেই প্রতিদিন নরবলি হয়। একটার পর একটা নরবলি। নরবলির নৈবেদ্য না পেলে কালীক্ষেত্রের দেবীর রসনা বুঝি তৃপ্ত হয় না। কাপালিকদের পুজো বুঝি নিয়ম-সিদ্ধ হয় না, কাপালিকদের সাধনা বুঝি পূর্ণাঙ্গ হয় না।

তাই চলো, কলকাতা চলো।

চলো চলো, কলকাতা চলো।

ওরা ওদিক থেকে আসছিল, আর এরা এদিক থেকে। সমস্ত কলকাতাটা ছড়িয়ে রাস্তা পড়ে আছে। যে যেদিক থেকে পারো চলতে পারো, সকলের সব জায়গায় যাবার এক্তিয়ার আছে। ওরাও তাই চলেছে।

রাত থাকতে উঠেছে ওরা। কোথায় সেই ধাব্‌-ধাড়া জয়চণ্ডীপুর, আর কোথায় এই কলকাতা।

—জায়, কালী মাঈকী জায়!

বুধবারির মানত ছিল কালিঘাটে। হে কালী মাঈ, আমার যদি এবার ছেলে হয়, তোমার কাছে পাঁঠা-বলি দেব মাঈজী, তোমার পুজো দেব, পরসাদ খাবো—

তা পাঁঠার দামও আজকাল বেড়েছে খুব। বুধবারির বাবা হরবনস্‌লাল যখন চল্লিশ বছর আগে বলির জন্যে পাঁঠা কিনেছিল, তখন একটা ছোট মাপের পাঁঠার দাম ছিল তিন টাকা। সেই তিন টাকা বাড়তে বাড়তে এখন একেবারে কুড়ি টাকায় এসে ঠেকেছে।

বুধবারি সেই পাঁঠাটা নিয়েই জয়চণ্ডীপুর থেকে ট্রেনে উঠেছিল। ছোট ট্রেন, ম্যাচবাক্সের মত চেহারা। তবু জয়চণ্ডীপুর থেকে ইস্টিশান পাকা তিন ক্রোশ রাস্তা। তিন ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসে তবে ট্রেন ধরতে হয়েছে। বুধবারির মা আগের রাত্রে জোয়ারের রুটি করে রেখেছিল। সেই রুটি খেয়েছে বুধবারি, বুধবারির বউ, আর বুধবারির মেয়ে।

বুধবারির বউটা মাথা-আলগা মানুষ। মাথায় কোনও কথা থাকে না। কোনও কথা নেই, বার্তা নেই, মেয়েটাকে ধরে বে-ধড়ক মারে।

বলে—ধাড়ি মেয়ে, বিয়ে দিলে অ্যাদ্দিন চারটে ছেলে পয়দা হতো, এখনও ক্ষিধে পেলে কাঁদে—চুপ রহো—

দলের সঙ্গে মেয়েটাও আছে। সামনে চলেছে বাপ। তার কাঁধের ওপর পাঁঠাটা। দু' হাতে পাঁঠাটার দু'দিকে ধরে আছে। পালিয়ে না যায়। তার পেছনে রাঙিয়া। বুধবারির বউ। রাঙিয়া ধরে রেখেছে মেয়েটার একটা হাত। আর সকলের শেষে বুধবারির মা। বুড়ো মানুষ। চলতে চলতে একটু পেছনে পড়ে গেছে, কিন্তু বুড়ী চলছে ঠিক।

হাওড়া ময়দানে এসে ট্রেন থেকে নেমেছিল সবাই। তারপর থেকেই হাঁটা। সামনেই গঙ্গার ওপর হাওড়ার পুলটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তার নিচেয় গঙ্গা।

বুধবারি পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে। মা ঠিক আসছে তো! তারপর একবার রাঙিয়ার দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর দুখিয়ার দিকে।

মা হাঁটতে পারছে না। রাস্তায় মানুষের ভিড়। জয়চণ্ডীপুরের মানুষ হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে এসে যেন হকচকিয়ে গেছে। খোলা হাওয়ার দেশ থেকে একেবারে শহরের ভিড়ের মধ্যে!

বুধবারি চেঁচিয়ে বললে—খুব হুঁশিয়ার, এ শহর কলকাত্তা—বহুত হুঁশিয়ার মাঈয়া—

মা-ও চোখ মেলে দেখছে কলকাতা শহরকে। তিরিশ-চল্লিশ সাল আগে আর একবার এসেছিল মা এই শহরে। এই শহর কলকাতায়। তখন বুধবারির বাপ বেঁচে ছিল। সেবারও একটা বখ্‌রি নিয়ে এসেছিল কালিমন্দিরে পুজো দিতে।

বুধবারির বাপ বলতো—গরীব ঢোঁড়ে খানা ঔর আমীর ঢোঁড়ে ভুখ—

বুধবারির মা কথাটার মানে বোঝেনি, বুধবারির বাবা হরবনস্‌লাল মানেটা

বুঝিয়ে দিয়েছিল। গরীব লোকের খাবার খুঁজতে খুঁজতেই জীবন কেটে যায়, আর বড়লোক কেবল ক্ষিধে খোঁজে। আজ এই বড়লোকের শহর কলকাতার দিকে চেয়ে চেয়ে তাই দেখছিল বুধবারির মা। এখানে সবাই বড়লোক, সবাই আমীর! কিন্তু চল্লিশ সাল আগেকার কলকাতার সঙ্গে যেন আজকের এ-কলকাতার কোনও মিল নেই। গঙ্গাজীর মাথার ওপর এই লোহার পুলটা তখন ছিল না।

বিরাট একটা বাসগাড়ি হাতীর মত একেবারে সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

বুধবারি হাঁ-হাঁ করে উঠলো—হাঁ-হা-হা—সামাল্‌কে—সামাল্‌কে—

কী ভাগ্যিস, একটুখানির জন্যে বুড়ী রেহাই পেয়ে গেছে।

—আমি তোকে বললাম এ কলকাতা শহর, একটু সামলে চলবি, এখখুনি তো বাসগাড়ি তোকে চাপা দিয়ে দিত বুড়িয়া। তখন দাঁত বার করে মরে যেতিস, বেশ হতো—

বুধবারির মা সত্যিই সামলে নিয়েছে। বললে—জানিস বুধবারি, তোর বাপ কী বলতো জানিস? বলতো গরীব ঢোঁড়ে খানা ঔর আমীর ঢোঁড়ে ভুখ—

বুধবারি রেগে গেল—রাখো তোমার বয়েত, একটু সামলে চলো—

তারপর বুধবারি এক কাজ করলে। কাঁধ থেকে পাঁঠাটা নামিয়ে গামছাটা দিয়ে ভালো করে তার গলাটা বেঁধে ফেললে। তারপর নিজের ধুতির খুঁটটা দিয়ে বউ-এর শাড়ির খুঁটের সঙ্গে বাঁধলে। বউ-এর শাড়ির খুঁটের সঙ্গে আবার মেয়েটার হাতের কবজি বেঁধে তার সঙ্গে মায়ের শাড়ির খুঁটটাও বেঁধে ফেললে। এইবার আর হারিয়ে যাবার যো নেই কারো। এইবার বুধবারি নিশ্চিন্ত! পাঁঠাটার পা-চারটে দু' হাতে জম্পেশ করে ধরে আবার চলতে লাগলো বুধবারি—জায় কালী মাঈকী জায়। জায় বজরঙওয়ালী কালী মাঈকী—জায়!

এতক্ষণে হাওড়ার পুল বেরিয়ে বুধবারির দলটা বড়বাজারের মোড়টার কাছে এসে পড়েছে, ওদিক থেকে একদল হাওয়া-গাড়ি আসছে, আর এদিক থেকে আর একখানা ট্রাম-গাড়ি। মাঝখানে পুলিশ-পাহারা দাঁড়িয়ে আছে।

হাঁ হাঁ হাঁ হা—

হঠাৎ সবাই হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছে। রোখ্‌কে! রোখ্‌কে! হুঁশিয়ার!

—কাঁহাকা গেঁইয়া আদমি হো তুম?

—আরে এরা যে রাস্তা চলতে পারে না, গেঁয়ো-ভূত এসেছে শহরের রাস্তায়। কাঁধে আবার একটা পাঁঠা বয়ে নিয়ে চলেছে!

—না হে, আজকের দিনে ওরাই হলো গিয়ে খাঁটি মানুষ হে, ওদের গেঁয়ো মানুষ বললে আমাদের নিজেদের গালাগালি দেওয়া হয়—

রাস্তায়-বাসে-ট্রামে কত রকম মানুষ, কত চরিত্রের জগাখিচুড়ি। ভালো-মন্দ-সাধারণ-অসাধারণের জড়াজড়ি নিয়ে জগৎ। ওরা যাচ্ছে অফিস-কাছারিতে টাকা উপায়ের কাজে। ওদেরই বা দোষ কী! কেউ টাকা উপায় করতে যাচ্ছে, কেউ নাম উপায় করতে। আবার কেউ বা মা-কালীর প্রসাদ। সেই যে একদিন আদি যুগ থেকে সুরু হয়েছিল অনাদি যাত্রা! একদিন পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে যাত্রা সুরু করেছিল ওরা এশিয়া মাইনর থেকে। এশিয়া মাইনর না সেণ্ট্রাল এশিয়া? না, তারও আগে মানুষ ছিল। দশ হাজার বছর আগেও মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেছে। বুধবারিরা জয়চন্ডীপুর থেকে হাঁটতে সুরু করেছিল। কিন্তু বুধবারির বাবা

হরবনস্‌লাল জয়চণ্ডীপুরের চেয়েও আরো দূরে কোথা থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছিল কে জানে। আর শুধু হরবনস্‌লাল কেন, হরবনস্‌লালেরও তো বাবা ছিল। হরবনস্‌লালের বাপের বাপ! হাজার হাজার লক্ষ-লক্ষ বছর কেটে গেছে এমনি করে। এক দেশ থেকে আর এক দেশে। এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে। ইষ্ট দেবতার সামনে তাদের কামনা-বাসনা কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। বলেছে—আমাকে ধন দাও মা, অর্থ দাও, রূপ দাও, জ্ঞান দাও—

চাওয়ার আর শেষ নেই মানুষের।

বুধবারির মা'রও তাই মনে হচ্ছিল। চল্লিশ সাল আগে এই কলকাতাতেই তাকে একদিন নিয়ে এসেছিল বুধবারির বাপ।

পেছনে আসতে আসতেই ডাকলে—ও বুধবারি—বুধবারি—

বুধবারি তখন কাপড়ের খুঁটে-খুঁটে গেরো বেঁধে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত ছিল মনে মনে। হঠাৎ মা'র ডাকে মেজাজটা খিঁচড়ে গেল।

—কী হলো? চিল্লাচ্ছ কেন?

মায়ের কাছে এসে দাঁড়াতেই মা বললে—দ্যাখ বেটা, তোর বাপ কী বলতো জানিস? তোর বাপ বলতো—গরীব ঢোঁড়ে খানা ঔর আমীর ঢোঁড়ে ভুখ।

বুধবারি রেগে গেল। প্রথমে বুধবারি ভেবেছিল বুঝি না-জানি কী জরুরী কথা আছে। দেখছে, এ কলকাতা শহর! এখানে ভিড়ের জ্বালায় মাথা-গরম হবার জোগাড়। এই সময় যত বাজে কথা। ওটা কী আর এমন নতুন কথা! চুপ রহো। সামনের রাস্তার দিকে নজর রেখে চলো। কোনও দিকে নজর দেবে না। খুব হুঁশিয়ার। এ কলকাতা শহর। জবর শহর! হ্যাঁ!

বুধবারি আবার চলতে লাগলো। ওপাশে বাসগাড়ি চলছে। ট্রামগাড়ি চলছে। হই-হল্লা চলছে। আর রাস্তার একপাশ ঘেঁষে চলছে বুধবারি, বুধবারির বউ রঙিয়া, বুধবারির মেয়ে দুখিয়া, আর সকলের শেষে বুধবারির বুড়ী-মা। সকলের সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়েছে বুধবারি। আর পাঁঠাটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছে। জায়, কালী মাঈকী জায়। জায় বজরঙ্‌ওয়ালী কালী মাঈকী—জায়।

হঠাৎ ওদিক থেকে একটা গাড়ি একেবারে বুধবারির ঘাড়ে এসে পড়লো—আর হায়-হায় আওয়াজ উঠলো চারদিক থেকে—

—হ্যাঁ গো, মারা গেছে, না বেঁচে আছে?

—ও মশাই, ওখানে অত ভিড় কীসের? কে চাপা পড়েছে?

—আহা গো, বেচারা! কাঁধে করে কেউ পাঁঠা নিয়ে হাঁটে। বোকার ডিম কোথাকার? সঙ্গে ওরা কারা? বউ? বউ আর মেয়ে? আর ওটা বুঝি ওর বুড়ী মা?

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল রাস্তার ওপর। রাস্তায় বেকার লোকের ভিড়ের অভাব হয় না। এতক্ষণ সবাই কাজে ব্যস্ত ছিল। রাস্তায় ভিড় দেখে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

—কী হয়েছে মশাই এখানে? কী হয়েছে?

ওরা ওদিক থেকে আসছিল আর এরা এদিক থেকে। এই সমস্ত কলকাতার সব পাড়াতেই ঢালাও রাস্তা পড়ে আছে। যে যেদিক থেকে পারো চলতে পারো। সকলের সব জায়গায় যাবার এক্তিয়ার আছে এই শহরে। তোমরাও চলো।

রাত থাকতে উঠেছে এরা। কেউ যাদবপুরে থাকে, কেউ গড়িয়া। কোথায় কার আস্তানা কেউ জানে না। একসঙ্গে জড়ো হবার পর সবাই সবাইকে দেখছে। তারপর একজন চাঁই এসে সবাইকে সার-সার দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে।

একজন চিৎকার করেছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

সবাই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়েছে—জিন্দাবাদ।

—আরো জোরে, আরো জোরে ভাই! একসঙ্গে সুর করে বলতে হবে জিন্দাবাদ!

অরবিন্দ সুরু থেকেই এই লাইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, লাইনের মধ্যে অরবিন্দর দাঁড়াবার কথা নয়। কীসের যে লাইন তাও অরবিন্দ জানতো না। হারান নস্কর লেনের দুটো বাড়ি তার ঠিকানা। একটা বাড়ি গলির বাঁ-দিকে, আর একটা ডানদিকে। অর্থাৎ সাত নম্বর বাড়িতে একখানা ঘর, আর আট নম্বর বাড়িতে আর একখানা। সাত নম্বরে থাকে অরবিন্দর মা আর কুড়ি বছরের আইবুড়ো বোন, আর আট নম্বরে থাকে অরবিন্দর বউ। মুখোমুখি বাড়ি। কিন্তু সাত নম্বর থেকে আট নম্বরে যেতে গেলে আট ফুট চওড়া গলিটা পেরোতে হয়।

আসলে অরবিন্দ মাংস কিনতে বেরিয়েছিল। খাসীর মাংস। এই আধ কিলো মাংস হলে চলে অরবিন্দর। মাংস অরবিন্দর বাড়িতে বড় একটা হয় না। মাংসের দাম আজকাল বড় বেড়ে গেছে। ছ' টাকার কমে ছাড়ে না। ডাক্তার বলেছে গোপাকে মাংস খাওয়াতে। গোপার নাকি বুকের দোষ। প্রোটিন খাওয়া দরকার। ডাক্তার বলেছে—আপনি হলেন ওর হাজব্যাণ্ড, আপনি যদি স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে না দেখেন তো কে দেখবে?

সুসীর কথাটাও মনে পড়লো অরবিন্দর।

নিজের মায়ের পেটের বোন। ছোট বেলায় খুব ছটফটে ছিল। বড় মাংস খেতে ভালবাসতো। বলতো—দাদা, কতদিন মাংস খাইনি বলো তো?

তা অনেক দিন যে মাংস হয়নি বাড়িতে তা জানতো অরবিন্দ। অরবিন্দ বলতো—আনবো আনবো, একদিন মাংস আনবো। বেশ একেবারে এক কিলো মাংস এনে খাইয়ে দেব তোদের—

এক কিলো মাংস একসঙ্গে খাওয়ার আনন্দটা কল্পনা করে সুসীর মুখ দিয়ে নাল পড়ে। নাল পড়ে গোপার মুখ দিয়েও—

আড়ালে অরবিন্দকে পেয়ে গোপা চুপি চুপি বলে—তুমি যে মাংস আনবে বললে, তা কোত্থেকে আনবে শুনি?

—কেন, আনতে পারি নে ভেবেছ?

—ওঃ, ভারি তোমার মুরোদ, তোমার মুরোদ আমি দেখে নিয়েছি—

অরবিন্দ রেগে যেত—তোমার জন্যেই তো...তোমার জন্যেই তো কিছু করতে পারি না—তুমি যদি একটু...

কথাটা শেষ করার আগেই চিৎকার করে উঠতো গোপা—থামো! থামো!

—কেন, আমি কি অন্যায্য কিছু বলিচি?

গোপাও চিৎকার করে উঠতো—খুব সোয়ামী হয়েছ তুমি! আমি পারবো না

সকলের খেদমত করতে! কেন, আমার কীসের দায় শুনি? তোমার মা, তোমার বোন, তাদের ওপরে তো তোমার জোর খাটে না। যত হেনস্থা আমার ওপর, না? আমার বুঝি শরীর-গতিক থাকতে নেই? আমি বুঝি গাছ? আমি বুঝি পাথর?

ভাগ্যিস আট নম্বর বাড়ির কথা সাত নম্বর বাড়িতে পৌঁছোয় না, তাই রক্ষে। নইলে ওপাশে বুড়ী অন্ধ শাশুড়ীও চিৎকার করে উঠতো—কী, এত বড় আস্পর্ধা তোমার বৌমা, তুমি আমার সুসীকে ঠেস মেরে কথা বলো?

তা ঠেস দেওয়ার মত কথাই বটে গোপার।

গোপা বলতো—কেন, সুসী তোমার নিজের মায়ের পেটের বোন বলে বুঝি এত আদর, আর আমি পরের বাড়ির মেয়ে কি না, তাই আমার ওপর এত জোর, না? খুব করবো বলবো, হাজার বার বলবো—

বউ-এর কাছ থেকে খোঁটা খেয়ে খেয়ে অরবিন্দর মনটাও খিঁচড়ে গিয়েছিল সেদিন। দুত্তোর নিকুচি করেছে বলে সেদিন অরবিন্দ সকাল বেলাই বাজারের থলেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। সামান্য এক কিলো মাংস তাই কিনা অরবিন্দ খাওয়াতে পারে না। ধিক্, তার জীবনে ধিক্।

মা জিজ্ঞেস করেছিল—কোথায় চললি আবার এত সকালে?

অরবিন্দ উত্তর দেয়নি প্রথমে!

—বলি, জবাব দিচ্ছিস নে যে, চললি কোথায়?

তখন চিৎকার করে উঠেছিল অরবিন্দ—যাবো আবার কোথায়, যাবো চুলোয়, তোমাদের পিণ্ডি গেলবার জোগাড় করতে—

থলিটা নিয়ে রাস্তায় তো বেরিয়েছিল, কিন্তু ট্যাঁকে তখন তার মা-ভবানী। কোথা থেকে টাকা আসবে তার ঠিক নেই, তবু থলিটা নিয়ে রোজ নিয়ম করে বেরোতে হয়। অরবিন্দ ভেবেছিল ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে গিয়ে একখানা দশ টাকার নোট হাওলাত চেয়ে নেবে!

'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' বাজারের দোকান। মালিক ছোকরা মানুষ। দিলীপ বেরা। এতদিন বেশ ছিল। খাবারের দোকানে মোটা টাকা মুনাফা পেয়ে দিলীপ বেরা দু'হাতে টাকা খরচ করতো। মাঝে-মাঝে এক-একটা শনিবারে রেসের মাঠে নিয়ে যেত অরবিন্দকে। দামী সিগারেট খেতে দিত। ট্যাক্সি চড়াতো। তারপরে ফেরার সময় যেটা অরবিন্দর সব চেয়ে প্রিয় বস্তু, দোকানে গিয়ে সেইটে খাওয়াতো। ভাল বিলিতি মাল। বিলিতি খেতে অরবিন্দর বড় ভালো লাগে।

দিলীপদা বলতো—আর এক পেগ খাবি নাকি রে অরবিন্দ—

অরবিন্দ বলতো—ক'পেগ খেইচি?

—আমি কি তার হিসেব রেখেছি নাকি? তুই কত খেলি তা তুই-ই জানিস্—

অরবিন্দ একটু কিন্তু-কিন্তু করতো—কিন্তু তুমি সে আজকে দু'হাজার টাকা হেরে গেছ দিলীপদা, আমি খাই কী করে?

—দু'হাজার টাকা রেসে হেরেছি তার জন্যে তুই কম খাবি? দিলীপ বেরা কখনও হিসেব করে মাল খেয়েছে?

তা দিলীপদা' ওই রকমই। বরাবর সাহায্য করেছে অরবিন্দকে। কিন্তু এখন হাত-বন্ধ। এখন সেই সন্দেশও নেই, সেই রসগোল্লা-পান্তুয়া, কিছুই নেই। এখন আর তেমন ইচ্ছে থাকলেও অরবিন্দকে যখন-তখন খাওয়াতে পারে না। আগে হাত

পাতলেই দিলীপদা'র কাছে ধার পাওয়া যেত। এখন যে টাকার টান পড়েছে সেটা দেখলে বোঝা যায়। এখনও রেসের মাঠে যায় দিলীপদা, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে। একলা একলা।

সেদিনও সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে অরবিন্দ দিলীপদা'র কাছে গিয়ে গোটা কতক টাকা হাওলাত্ নেবে! একেবারে খালি হাতে ফেরাবে না দিলীপদা, হয়ত শুধু একটু ঠাট্টা করবে। হয়ত বলবে—কী রে, সুসীর বিয়ে দিচ্ছিস নাকি?

সুসীকে নিয়ে একটু ঠাট্টা তামাশা করে দিলীপদা!

অরবিন্দ বলতো—তুমি আর সুসীকে নিয়ে ঠাট্টা কোর না দিলীপদা—

—কেন, ঠাট্টা করবো না কেন? সুসী তোর বোন হয় বলে?

অরবিন্দ বলতো—না না, সুসীর কানে গেলে রাগ করবে—

—রাগ করলো তো বয়েই গেল। আমি সুসীকে কত টাকা সাপ্লাই করেছি, বল তো? সেদিন যে সিফন্-শাড়িটা পরে সিনেমায় যাচ্ছিল, ওটা তো আমারই কিনে দেওয়া—হ্যাঁ কি না বল?

—অত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছো কেন? লোকে শুনতে পাবে যে?

—থাম্ তুই! গলার হারটা আর ওই শাড়িটা তো আমিই দিয়েছিলুম গেল পুজোয়!

—আঃ, আমি কি বলছি তুমি দাওনি?

দিলীপদা বোধহয় রেগে গিয়েছিল। বললে—তা আমাকে দেখে সুসী তাহলে মুখ ঘুরিয়ে নিলে কেন সেদিন? যেন কত সতী একেবারে! কলেজের মেয়েদের সামনে দেখাতে চায় যেন সব শাড়ি-গয়না গুণধর দাদার কিনে দেওয়া, না?

এমন করে কথাগুলো বলে দিলীপদা যে বড় ভয় করে অরবিন্দর। বাইরের কেউ শুনতে পেলেই বিপদ! 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে' আগে খদ্দেরের ভিড় থাকতো সব সময়ে। যার-তার সামনে যা-তা কথা বলা স্বভাব দিলীপদা'র। অরবিন্দ ভেবেছিল দিলীপদা'র কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলবে—দশটা টাকা দিতে পারো দিলীপদা?

দিলীপদা হয়ত বলবে—কেন, দশ টাকায় সুসী কী কিনবে?

—সুসী অনেক দিন মাংস খায়নি, তাই ভাবছিলুম এক কিলো মাংস কিনে নিয়ে যাবো—

সব প্ল্যান মাথায় ছিল অরবিন্দর। কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল মিছিলটা দেখে। 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'টা বড় রাস্তার মোড়ের ওপর। সেখানে গিয়েই দেখেছিল মিছিলের জমায়েত। চেনা-শোনা অনেকেই রয়েছে ভিড়ের ভেতর, আবার অনেক অচেনা মুখ।

—ও অরবিন্দবাবু, আসুন না!

দূরে দাঁড়িয়ে ছিল কেলো-ফটিক। ফটিক নামের দু'জন আছে পাড়ায়। একজন কালো, একজন ফরসা। গোলমাল এড়াবার জন্যে একজনকে কেলো-ফটিক বলে ডাকে সবাই, আর একজনকে শুধু ফটিক। লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল কেলো-ফটিক।

অরবিন্দ বলেছিল—কোথায় যাচ্ছিস্ রে তোরা?

—আসুন না, কলকাতায় যাচ্ছি—

—কেন, আজকে আবার কী আছে?

তখন সবে ভিড় জমাবার চেষ্টা হচ্ছে। লোকজন জড়ো করবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আশেপাশের পার্টির ছেলেরা অরবিন্দকে পিঠে হাত দিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলে। অরবিন্দ গিয়ে কেলো-ফটিকের পাশে দাঁড়ালো!

—এক লাইনে দাঁড়ান, লাইন ভাঙবেন না!

অরবিন্দ বললে—আমি যে মাংস কিনতে বেরিয়েছিলাম রে।

—আরে মাংস পরে হবে। আমরা বলে ভাত খেতে পাচ্ছি না, আপনি মাংস কিনতে এসেছেন!

অরবিন্দ নিজের কাছে যেন লজ্জায় পড়লো। বললে—আরে না ভাই কেলো তা নয়, আসলে ডাক্তার বউকে মাংস খাওয়াতে বলেছে। বলেছে প্রোটিন-ফুড্ চাই। কিন্তু ডাক্তার তো বলেই খালাস। টাকা দেবার বেলায় তো সেই আমিই। মাংস কেনা কি সোজা কথা ভাই অজকাল? যা গলা-কাটা দর। তা ভাবলাম, বছরে একটা তো দিন—

—আপনার বউএর কী হয়েছে?

—কী আর হবে ভাই। না খেতে পেলে যা হয়, বুকের দোষ।

—বুকের অসুখ তো চেঞ্জে নিয়ে যান না?

—দূর, কী যে বলিস তুই? ছ'টাকা কিলোর মাংস খাওয়াতে পারছি না তার ওপর চেঞ্জ! বেটাছেলে হলে কোনও ভাবনা ছিল না, কিন্তু মেয়েমানুষ যে, কিছু বলতে পারি না—

ততক্ষণ সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে।

অরবিন্দ বললে—তা কতক্ষণ লাগবে তোদের?

—কতক্ষণ আর লাগবে, বেশিক্ষণ নয়, বারোটা-একটার মধ্যে ফিরে আসবো সবাই। আসবার সময় বাসে চড়ে চলে আসবো।

—কিন্তু হঠাৎ আজকে সকাল বেলা কেন? অন্যবার তো দুপুরবেলা বেরোয়?

কেলো-ফটিক বললে—আজ যে শনিবার—শনিবার যে আধরোজ আপিস হয়—

অরবিন্দ বললে—তা শনিবার মিছিল বার করা কি ঠিক হচ্ছে? আজ তো রেসের দিন! বাবুরা বাজি ধরতে মাঠে যাবে! দিলীপদাও তো ব্যস্ত—

কেলো-ফটিক কথাটা তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিলে।

বললে—আরে, আপনিও যেমন, আমাদের আবার শনিবার-শুককুরবার! আমাদের কাছে যাঁহা শনিবার তাঁহা শুককুরবার! বারের হিসেব রাখবে বাবুরা, আমরা তো ফতো-বাবু—

অরবিন্দ কেলো-ফটিকের কথায় মন দিয়ে সায় দিতে পারলে না। কারা বাবু আর কারা বাবু নয়, তা বাইরেটা দেখে কে বিচার করবে! অরবিন্দকেও তো বাইরে থেকে সবাই বড়লোক বলেই জানে। জামা-কাপড় জুতো দেখে তো তাই-ই মনে হবে। অরবিন্দ যদি বড়লোক হয় তো কলকাতার সবাই বড়লোক।

তা ঠিক আছে। ফিরে এসেই দিলীপদা'র কাছে টাকাটা চেয়ে নেবে।

অরবিন্দর মনে পড়লো 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র দিলীপদা একদিন আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল অরবিন্দকে। গলা নিচু করে বলেছিল—কীরে, কী করছিস আজকাল?

কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল অরবিন্দ। বলেছিল—কী আবার করবো, কখনও কিছু করেছি যে আজ করবো? কাজ আর কে দিচ্ছে বলো না আমাকে?

—তা তোর আর কাজ করেই বা কী হবে, অত বড় ধাড়ি বোন তোর ঘরে।

অরবিন্দ এ-সব কথায় লজ্জায় পড়ে না। বরং হি হি করে হাসে। বলে—কী যে তুমি বলো দিলীপদা, তার ঠিক নেই। ধাড়ি বোন তা আমার কী?

দিলীপদা হাসে না। মিষ্টি বিক্রির কাঁচা পয়সার মালিককে সহজে হাসতে নেই।

বলে—কথাটাতে হাসির কী আছে শুনি? আমি একটা সিরিয়াস কথা বলছি, আর তুই গবেটের মত দাঁত বার করে হাসছিস? হাসিস নি। অত হাসি ভাল নয়—

—আচ্ছা দিলীপদা আর হাসবো না। বলো না, কী বলছিলে?

—মবলক্ কিছু টাকা উপায় করবি?

অরবিন্দ বললে—কী করতে হবে, বলো?

দিলীপদা বললে—কিছছু করতে হবে না। খাটনি-ফাটনি কিছছু নেই, স্রেফ্ ফোকটের টাকা। একজন কাপ্তেন লোক কিছু পয়সা ওড়াতে চায়—

—কাপ্তেন লোক?

অরবিন্দ বুঝতে পারলে না কথাটা।

—আরে কাপ্তেন মানে কাপ্তেন। যাকে বলে ক্যাপটেন। বেশ মালদার মানুষ। দু' নম্বর টাকা জমে জমে শ্যাওলা পড়ছে। খরচ করবার রাস্তা পাচ্ছে না।

অরবিন্দ তবু বুঝতে পারলে না।

—তা আমি কী করবো?

দিলীপদা বললে—না, আমি তাকে তোর কথা বলেছি। লোকটা তোর সঙ্গে ভাব করতে চায়—মিশেই দ্যাখ না তার সঙ্গে, হয়ত তোরও কিছু হিল্লে হয়ে যেতে পারে—বলা যায় না—

অরবিন্দ তখন জিনিসটা একটু বুঝতে পেরেছে।

বললে—আমার কী হিল্লেটা হবে?

দিলীপদা রেগে গেল। বললে—হিল্লে হবে না? দু'নম্বর টাকার মালিক তোর সঙ্গে ভাব করতে চাইছে কি ওমনি-ওমনি? কিছু গাঁট-গচ্ছা দিতে হবে না? না দিলে তুই ছাড়বি কেন? আচ্ছা করে দুয়ে নিবি। ও তো টাকা খরচ করবার জন্যে হাঁস-ফাঁস করছে, খরচ করবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না—

এতক্ষণে অরবিন্দ নরম হলো। বললে—কত দেবে?

দিলীপদা বললে—তুই আগে কতখানি ছাড়তে পারবি তাই বল? তোর বোনটা রাজী হবে?

অরবিন্দ জিভ কাটলে।

বললে—তুমি যে কী বলো দিলীপদা তার ঠিক নেই, সুসী শুনলে রেগে এ্যাকসা করবে, তা আমার জানা আছে—।

তারপরে হঠাৎ দিলীপদা যেন রেগে গেল।

বললে—তাহলে আমিও সাফ কথা বলে দিচ্ছি, আমার কাছে আর টাকা ধার চাইতে আসিস নি বাপু, আমি আর টাকা দিতে পারবো না তোকে। আমার সন্দেশ-রসগোল্লা নেই, আমি নিজেই এখন ফতুর হয়ে গেছি—

দিলীপদা চটে যাচ্ছে দেখে অরবিন্দ নরম হয়ে গেল।

বললে—তুমি রাগ করছো কেন দিলীপদা, তুমি রাগ করলে আমার কী করে চলে বলো দিকিনি! মা'র রোজ এক পোয়া রাবড়ি আমি কোত্থেকে যোগাই বলো দিকিনি? সুসীর শাড়ি, গোপার ওষুধ...

—গোপা? গোপার আবার কীসের ওষুধ?

দিলীপদা কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

অরবিন্দ বললে—বা রে, তোমাকে তো বলেছি। গোপার বুকের দোষ তোমায় বলিনি? গোপার ওষুধ কিনতে কিনতেই তো আমার শালার জান নিকলে গেল! তারপর দু'টো বাড়ির ভাড়া। একটা সাত নম্বর, আর একটা আট নম্বর। দু'জন বাড়িওয়ালাই তো নোটিশ দিচ্ছে—

ও-সব দিলীপদা জানে। তাই বললে—এখন তোর যা ভাল বিবেচনা তাই কর। তোর ভালোর জন্যেই আমার বলা। নইলে আমার কলাটা—

অরবিন্দ তখন গলার সুরটা আরো নরম করে দিলে।

বললে—তা তুমি যখন রেকমেণ্ড করছো তখন আর আমার আপত্তি কীসের। শুধু একটা কথা, মদ-ফদ খায় না তো ভদ্রলোক—

—আরে, তোর দেখছি আক্কেল বলিহারি!

অরবিন্দ মাঝপথে বাধা দিয়ে বললে—না দিলীপদা, আমি সে-জন্যে বলছি না। মানে ভদ্রলোকের পাড়ার মধ্যে থাকি তো। হারান নস্কর লেনের সাত নম্বর বাড়িতে তুমি তো কতবার গিয়েছ, পাড়ার মধ্যে একটা কেলেঙ্কারি হলে, বুঝলে না—

দিলীপদা বললে—সে আমি গ্যারাণ্টি দিতে পারবো না বাপু, টাকাওয়ালা লোক, জোয়ান স্বাস্থ্য অর মদ খাবে না, তা কী হয়?

অরবিন্দ বললে—তা মদ খাক. কিন্তু মাতলামি যেন না করে এইটি শুধু তুমি তাকে বলে দিও দিলীপদা—মানে পাড়ার মধ্যে জানাজানি হোক এটা চাই না—

দিলীপদা বলেছিল—সে তোকে ভাবতে হবে না, আমিও তো ভদ্দরলোকের ছেলে রে, আমার একটা দায়িত্ব-জ্ঞান নেই?

বলে আবার দোকানের গদিতে উঠে ক্যাশবাক্সের সামনে গিয়ে বসেছিল। তখন ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ভেতর অনেক খদ্দের এসে ভিড় জমিয়েছে।

হ্যাঁ, এই হলো সূত্রপাত!

মানে এই যে-গল্প লিখতে বসেছি, যে-গল্পের সুরুতে বুধবারি পাঁঠা কাঁধে করে নিয়ে কলকাতার রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে. আর যে-রাস্তায় মানুষের মিছিল চলেছে কলকাতার রাজভবন লক্ষ্য করে, সেই মিছিলের আরো হাজারটা লোকের

মধ্যেই এই অরবিন্দ রয়েছে। যে অরবিন্দর বাইরে ফরসা সার্ট, পায়ে পালিশ করা নিউকাট, আঙুলে সোনার আংটিতে গোমেদ, আর পকেট ফাঁকা। তাকে বলো ইণ্ডিয়ার কনগ্রেস-গভর্নমেণ্টকে গালাগালি দিতে, সে টপ-টপ করে গভর্নমেণ্টের সব দোষগুলো এক নাগাড়ে বলে যাবে। সেগুলো তার মুখস্থ। তাকে বলো রাশিয়া-আমেরিকা-চায়নার পলিটিক্স আলোচনা করতে, সেও তার মুখস্থ। রাস্তায় পার্কে 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে' চায়ের দোকানে অরবিন্দ বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে আর তারপর দুপুর একটার সময় সাত নম্বর বাড়িতে এসে চান করে ভাত খেয়ে আট নম্বর বাড়িতে গিয়ে ঘুমোবে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত। সেই তখন উঠে এক কাপ চা খাবে, খেয়ে ফরসা জামাকাপড় পরে আবার বেরোবে।

আর তারপর?

আর তারপরই হলো আসল উপন্যাস।

আসল উপন্যাস অবশ্য আরম্ভ হয়েছে সেই মার্টিন কোম্পানীর জয়চণ্ডীপুর থেকে। সেই যেখান থেকে বুধবারিরা আসছে পাঁঠা কাঁধে করে কালিঘাটে বলি দেবার জন্যে। আর এদিক থেকে যখন একটা মিছিল চলেছে রাজভবনের দিকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যয়ের শেকড়ের ওপর নতুন করে গজিয়ে উঠছে আর এক অবিশ্বাসী সমাজের আগাছা। সে সমাজের রান্নাঘর কলতলা হলো হারান নস্কর লেনের সাত নম্বর বাড়ি, আর আট নম্বর বাড়িতে হলো তার শোবার ঘর।

সেই আট নম্বর ঘরেই সেদিন সন্ধেবেলা গোপা ভাঙা চেয়ারখানায় বসে বসে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পড়ছিল। শ্রীকান্ত বইখানা যে ভাল বই বলেই পড়ছিল তা নয়। আসলে সারা বাড়ি দুটোতে বই বলতে যা তা ওই একখানাই। হয়তো বইখানার কী নাম কিংবা কার লেখা তাও জানে না। একটা কিছু করতে হবে বলেই বই মুখে দিয়ে বসে থাকা।

হঠাৎ ঘরে ঢুকলো অরবিন্দ। সঙ্গে আর একজন বেশ সাজ-গোজ করা ভদ্রলোক।

ঘরে ঢুকতেই গোপা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

অরবিন্দ বললে—এইটে হলো আট নম্বর। রাস্তার নাম ওই একই, হারান নস্কর লেন। আপনার খুব কষ্ট হলো তো শিরীষবাবু...

শিরীষবাবু আদ্দির পাঞ্জাবির তলায় ঘামছিল।

অবাক হয়ে বললে—কেন?

—আপনার গাড়িটা গলির বাইরে রেখে হেঁটে আসতে হলো।

—আরে তাতে কী হয়েছে! গাড়ি আছে বলে কি হাঁটতেও ভুলে গেছি নাকি। কী যে বলেন আপনি অরবিন্দবাবু!

বলে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। তারপরে ছাদের দিকে মুখ তুলে তাকালো।

—পাখাটা আর একটু জোরে ঘোরে না?

অরবিন্দ নিজের দারিদ্র্য হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইলে—সেই কথাই তো আপনাকে এতক্ষণ বলছিলুম স্যার, আমাদের দেশটা বড় পাজি দেশ হয়ে গেছে, কাউকে বিশ্বাস করবার যো নেই, সব বেটা জোচ্চোরের ধাড়ি—

—কেন?

শিরীষবাবু কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারলে না। পাখাটার সঙ্গে দেশের কী

সম্পর্ক তা তার বোধগম্য হলো না সেই মুহূর্তে।

—এই দেখুন না, আজকাল লেবারদের কী রকম তেজ দেখুন না। দশ দিন মেকানিক-মিস্ত্রির বাড়িতে হেঁটে হেঁটে আমার পায়ের রং-খিল খুলে গেল। তারপর যখন বাবু দয়া করে একদিন এলেন তখন একটুখানি হাত ছোঁয়ালেন আর পঁচিশটি টাকা মাথায় চাঁটি মেরে নিয়ে চলে গেলেন!

এ-সব বাজে কথা ভাল লাগছিল না শিরীষবাবুর। নিজে থেকেই গোপার দিকে দুই হাত জোড় করে নমস্কার করে বললে—এঁর সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলেন না অরবিন্দবাবু—

অরবিন্দ জিভ কাটলে—দেখুন দিকি কান্ড, আরে এই-তো আমার ওয়াইফ গোপা, আর ইনি হচ্ছেন শিরীষবাবু।

ভদ্রলোক পাদপূরণ করে দিলেন—শিরীষ দাশগুপ্ত—

—হ্যাঁ হ্যাঁ শিরীষ দাশগুপ্ত, জুয়েলার্স—

শিরীষবাবু আবার পাদপূরণ করে দিলে—জুয়েলার্স এ্যান্ড ওয়াচ ডীলার্স—

—হ্যাঁ হ্যাঁ জুয়েলার্স এ্যান্ড ওয়াচ ডীলার্স! আপনার বুঝি আবার ঘড়ির কারবারও আছে শিরীষবাবু?

শিরীষবাবু বললে—সোনার কারবারে তো আপনাদের গভর্নমেণ্ট বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, ওই ঘড়ি বেচেই যা দুটো খেতে পাচ্ছি—আর সম্প্রতি একটা গ্লাস-ফ্যাক্টরি করেছি বেনামীতে, ইণ্টারন্যাশন্যাল গ্লাস ফ্যাক্টরি—

—তা ঘড়ির ব্যবসা তো ভালো ব্যবসা শিরীষবাবু! ঘড়ির কি আজকাল কম দাম?

শিরীষবাবু গলায় হতাশার সুর ঢেলে বললে—আরে দূর, ভালো না ছাই, আজকাল কি আর সেই রকম দিনকাল আছে? মাসে দশ হাজার টাকা উপায় করতে আমার জিভ বেরিয়ে আসে, কিছছু লাভ নেই—

—দশ হাজার?

—তা তার কমে তো আর ভদ্রভাবে চালাতে পারা যায় না। তিনখানা গাড়ির পেটে কি কম পেট্রল খায় ভেবেছেন?

তারপর হঠাৎ বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথা ধরলে। বললে—এ সব কথা থাক এখন অরবিন্দবাবু, সারা দিন টাকার কথা ভাবতে ভাল্লাগে না, তা আপনি কী বই পড়ছিলেন? আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না—

অরবিন্দরও যেন এতক্ষণে নজরে পড়লো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো, তুমি আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস না।

ঘরের ভেতরে মাত্র দুখানা চেয়ার। অথচ তিনজন লোক। গোপা যেন একটু দ্বিধা করছিল। কিন্তু এ রকম ঘটনা এই প্রথম নয়, তাই আর দেরি না করে বাকি চেয়ারটায় বসে পড়লো গোপা।

—আর আপনি?

অরবিন্দ বললে—আমার কথা ছেড়ে দিন, আমারই তো বাড়ি মশাই, আমি তো সারা দিন বসেই আছি—তার চেয়ে আপনারা একটু আলাপ করুন, আমি আসছি—

—আপনার সিসটার কোথায়? তার সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলেন না

অরবিন্দবাবু!

আসলে শিরীষবাবু যার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল, সে-ই গর-হাজির। ব্যাপারটা কি রকম সুবিধের মনে হচ্ছিল না শিরীষবাবুর। অথচ 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র দিলীপ বলেছিল একটা ধাড়ি বোন আছে বাড়িতে।

—আমি আসছি শিরীষবাবু, এখনি আসছি—

—কোথায় যাচ্ছেন আবার?

অরবিন্দ হাসলো। বললে—ভয় নেই, পালাচ্ছি না, আসছি—

বলেই সেই সন্ধেবেলা শোবার ঘরের মধ্যে দুজনকে রেখে অরবিন্দ গলি পেরিয়ে সোজা সাত নম্বর বাড়িতে চলে গেল। বোধ হয় চায়ের ব্যবস্থা করতে।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

—সবাই জোরসে বলো ভাই জিন্দাবাদ! একজন চেঁচাবে ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলে আর আপনারা শুধু একসঙ্গে বলবেন—জিন্দাবান।

তা ততক্ষণে এদিক-ওদিক থেকে টেনেটুনে জন পঞ্চাশেক জোগাড় হয়েছে। আরো জন পঞ্চাশেক জোগাড় হলে ভালো হতো। শ্যামবাজারের দিক থেকে নর্থের দল আসবে, আর এই সাউথের দিক থেকে যাবে এই দল। দু'দিক থেকে অ্যাটাক করতে হবে রাজভবন। পুলিশ দল যেন দু'ভাগ হয়ে যায়।

যাদবপুরের এ-পাড়ায় তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ।

কে একজন সাইকেল চড়ে যেতে যেতে বলে গেল—এ সব প্রোসেশান করে কিছু হবে না ভাই. ভোট দেওয়ার সময় সবাই কংগ্রেসকেই তো ভোট দেবে।

কেলো-ফটিক চিৎকার করে উঠলো—শালা নিশ্চয়ই সরকারের দালাল রে—

তারপর অরবিন্দর দিকে নজর পড়লো—কী অরবিন্দবাবু, কী ভাবছেন?

অরবিন্দ বললে—দিলীপদা'র কথা ভাবছিলুম। ভেবেছিলুম দিলীপদা'র কাছ থেকে কিছু টাকা হাওলাত্ নেব—

—দিলীপদা কে?

—ওই যে 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র প্রোপ্রাইটার। তা দেখা হলো না—টাকা না পেলে মাংসটা কেনা হবে না—

—মাংস-টাংস খাওয়ার কথা ছাড়ুন এখন। দু'দিন বাদে ভাতই জুটবে না কপালে, এই বলে রাখলুম আপনাকে! পারেন তো দলে ঢুকে পড়ুন—

বহুদিন থেকেই কেলো-ফটিক তাকে দলে ঢুকে পড়তে বলছিল। কিন্তু আজকে তো অরবিন্দ সব দলেই আছে। তোমার দলেও আছি, আবার ওদের দলেও। কেউ আমার পর নয়। ওই দিলীপদাই বলো, আর শিরীষবাবুই বলো, সবাইকেই আমাকে হাতে রাখতে হবে। সবার কাছ থেকেই টাকা ধার নিতে হবে।

প্রথম-প্রথম শিরীষবাবু একটু লাজুক ছিল। প্রথম দিন তো লজ্জাতে গোপার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারেনি। প্রথম দিন যখন শিরীষবাবুকে আট নম্বর বাড়িতে বসিয়ে বাইরে চলে এসেছিল তখন অরবিন্দ ভেবেছিল সে

বাইরে চলে এলেই শিরীষবাবুর আড়ষ্ট ভাবটা একটু কমবে। হাজার হোক পরের বউ তো!

সাত নম্বরে আসতেই মা বললে—কী রে, এ রাবড়ি তুই কিনে আনলি নাকি ?

অরবিন্দ বললে—আমি তো কিনে আনতুম, কিন্তু আমার বন্ধু যে ছাড়লে না—

—তোর বন্ধু? এ আবার তোর কোন্ বন্ধু? বলাই ?

—দূর, কী যে তুমি বলো। সে তোমাকে কখনও এক কিলো রাবড়ি দিয়েছে? তার অত টাকা আছে? এ বন্ধুর ক'টা গাড়ি জানো?

—কী জানি বাপু, তোর বন্ধুর ক'টা গাড়ি আমি কী করে জানবো?

অরবিন্দ রেগে গেল—যা জানো না, তা নিয়ে তাহলে কথা বলতে আসো কেন? রাস্তায় গিয়ে দেখে এসো কত বড় গাড়ি, পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম,—

মা বললে—আমি আর দেখেছি, আমি বলে ভাতের থালাই দেখতে পাইনে। তুই তো একটা চশমাও করে দিলি নে আমার—

—এবার করবো! আমার এই বন্ধুই করে দেবে! এর এই রকম তিনখানা গাড়ি আছে, জানো মা। একখানা গাড়ির দাম যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় তা হলে তিনখানা গাড়ির দাম ভাবো। শিরীষবাবু খুশী হলে চাই-কি একখানা বাড়িও দিয়ে দিতে পারে। চশমা তো ছার—

—তা আমার চশমার দরকার নেই, তুই বরং একদিন সুসীকে আর বৌমাকে মটর চড়িয়ে নিয়ে আয়, ওরা মটর চড়তে পায় না—

অরবিন্দ বললে—আরে, সেই জন্যেই তো আমার বন্ধুকে বাড়ি নিয়ে আসা। আমার মতলব তো তাই। কিন্তু তোমার মেয়ে তো সে কথা বোঝে না। বড়লোক বন্ধু যারা তাদের একটুখানি খাতির করলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

—তা সুসী তো তোর বন্ধুদের খাতির করে! করে না?

—ছাই করে! ও যদি একটু আমার কথা শুনতো তো আমার এই দুর্দশা! সেদিন বললাম আমার এক বন্ধু আসবে তাকে একটু খাতির করে নিজের হাতে চা দিয়ে আয়, তা শুনলে? এই যে তোমার আফিমের নেশা, তোমার রাবড়ি আমি রোজ রোজ কোত্থেকে যোগাই বলো তো?

মা হঠাৎ বললে—শুনছি নাকি দোকানে আর রাবড়ি করছে না? গবরমেণ্ট নাকি করতে দিচ্ছে না।

—তুমিও যেমন!

অরবিন্দ বললে—শিরীষবাবুকে যদি বলি আমার মা'র জন্যে গাধার দুধ চাই তো তাই-ই জোগাড় করে দেবে, এর নাম টাকার জোর। এখন তো দিলীপদা লুকিয়ে লুকিয়ে সন্দেশ-রসগোল্লা বাড়িতে বাড়িতে যোগান দিচ্ছে—

হঠাৎ মা'র বোধ হয় খেয়াল হলো। বললে—তুই ওখানে করছিস কী?

—কী আবার করবো, চা করছি। তোমার মেয়েকে দিয়ে তো এতটুকু উব্‌কার হবার যো নেই। একটা বন্ধু এল বাড়িতে, তাও যে-সে বন্ধু নয়, কোটিপতি বন্ধু, তাকে তো শুধু মুখে বিদেয় করে দিতে পারি না—

—তা বৌমা কোথায় গেল? বৌমাকে চা করতে বললি নে কেন?

—তোমার কেবল বৌমা আর বৌমা! কেন, বৌমা ছাড়া কি আর বাড়িতে

মানুষ নেই?

—তা চা করতে আর কী এমন খাটুনি! চোখ থাকলে আমিই করে দিতে পারতুম।

—তোমাকে কি আমি করতে বলেছি?

—না, আমি বলছিলুম বৌমাকেই চা করতে বলতে পারতিস! তুই কেন আবার হাত দিতে গেলি?

—তা বাড়িতে একটা ভদ্রলোক এলো, সঙ্গে কথা বলাও তো একটা কাজ। তোমার বৌমা আছে বলে তবু তো একটু ভদ্রতা রক্ষে হয়। নইলে কে এ সব করতো শুনি!

ততক্ষণে দু' কাপ চা করে নিয়ে অরবিন্দ বাড়ি থেকে বেরোল। দুটো হাতে দুটো চায়ের গরম কাপ। সাত নম্বর বাড়ির সদর দরজাটা পেরিয়ে একটু ডান-হাতি গেলেই আট নম্বর বাড়ির ঘরখানা। সেইটেই অরবিন্দর বেড-রুম-প্লাস-বৈঠকখানা। যেদিন বৃষ্টি হয় সেদিন ছাতা মাথায় দিয়ে ও-ঘরে যাতায়াত করতে হয়। ঘরটার ভেতরে বসলে গলির দিকের দুটো জানালা বন্ধ করে দিতে হয়, নইলে তক্তপোষখানার ওপর বিছানাটা নজরে পড়ে। শুয়ে থাকলে আস্ত শরীরটা পথচারীদের করুণার ওপর সমর্পণ করা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় থাকে না। এমনিতে শীতকালে বিশেষ অসুবিধে হয় না অরবিন্দর। রাত্রিবেলা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেই হলো। তারপর যত ইচ্ছে নাক ডাকাও। কিন্তু গরমের রাতে সারা রাত পাখা খুলে দিয়েও দুজনে ঘামে একেবারে রোস্ট হয়ে যায়। তখন যে গায়ের কাপড় খুলে দিয়ে একটু ঠাণ্ডা হবে তার উপায় নেই। জানালা দরজায় আবার অসংখ্য ফুটো। রাস্তার গুণ্ডা-বদমাইস কেউ যদি কৃপাদৃষ্টি দিতে চায় তো তাতে বাধা দেবার কিছু নেই।

অরবিন্দ খবরের কাগজগুলি পাকিয়ে ফুটোগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির জলে আবার সেগুলো পচে যায়। পচে গিয়ে আবার ফাঁক হয়ে যায়। তখনই হয় বিপদ।

অরবিন্দর যেসব বন্ধু ঘরে এসে বসে তারা এই ফুটোগুলোর সন্ধান রাখে না। বসে বসে একান্তে গোপার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে। অরবিন্দর যদি ইচ্ছে হয় তো বাইরে দাঁড়িয়ে ওই ফুটো দিয়ে দেখে যেতে পারে ভেতরে কী হচ্ছে।

কেউ কেউ বেশ গোপার কাছে গিয়ে বসে। একেবারে মুখোমুখি।

বন্ধুরা গোপার মুখোমুখি বসুক, সেইটেই মনেপ্রাণে চায় অরবিন্দ। যত ঘেঁষাঘেঁষি বসবে তত আনন্দ হবে অরবিন্দর। আর যদি দেখে বন্ধুরা গোপার হাত ধরে আছে, কিংবা মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলছে তাহলে আনন্দ আর ধরে না।

সেই জন্যেই চা আনবার নাম করে অরবিন্দ আট নম্বর বাড়ি থেকে সাত নম্বর বাড়িতে চলে যায়। যাবার সময় দরজা-জানালাটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে যায়, যেন দুজনে একটু আড়াল পায়, যেন দুজনে একটু ঘেঁষাঘেঁষি বসবার সাহস পায়।

হঠাৎ সামনেই যেন ভূত দেখলে অরবিন্দ।

—কীরে সুসি, তুই? এত সকাল-সকাল যে?

সুসী মানে সুসীমা। আগে ছিল সুশীলা। মা-ই নাম রেখেছিল। কিন্তু ও-নাম পছন্দ হয়নি সুসীর। কী যাচ্ছেতাই সেকেলে নাম! সুশীলাই শেষকালে সুসীমা হয়ে গিয়েছিল। দাদাকে চা নিয়ে যেতে দেখে সুসী বুঝলো আবার কোনও বন্ধু এসেছে।

অরবিন্দকে পাশ কাটিয়ে সুসী ভেতরেই চলে যাচ্ছিল, কিন্তু দাদা যেতে দিলে না।

বললে—বাইরে একটা বড় গাড়ি দেখলি?

—দেখেছি, খুব বড়লোক বুঝি?

অরবিন্দ বললে—হ্যাঁরে, ওই রকম তিনখানা গাড়ি আছে, টাকার কুমীর! চা নিয়ে যাচ্ছি। বলছিল আমার সিসটারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে—

—তোমাকে কত টাকা দিয়েছে?

—ওই তোর কেবল এক কথা। কেন, সামনে গেলে তোর কী হয়? তোকে খেয়েও ফেলবে না বা কিছু না, শুধু চা'টা দিয়ে আসবি। আর কিছু করতে হবে না, মাইরি বলছি।

সুসীর গা দিয়ে ভুর ভুর করে সেণ্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। একটা নতুন সিল্কের শাড়ি পরেছে সুসী, পায়েও নতুন এক জোড়া চটি। অরবিন্দ এক পলকে সবটা দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল।

বললে—ঠিক আছে, আমি তোকে কারো সঙ্গে আলাপ করতে বললেই যত দোষ, আর তুই নিজে যে কত লোকের সঙ্গে ঘুরিস, আমি বুঝি টের পাই না?

ক্ষেপে উঠলো সুসী। বললে—আমি নিজে ঘুরি?

—হ্যাঁ ঘুরিসই তো! সব্বাই তোকে ঘুরতে দেখে!

—কে দেখেছে আমাকে ঘুরতে, বলো। কার সঙ্গে ঘুরতে দেখেছে? তোমাকে বলতেই হবে। অমনি-অমনি আমার নামে দোষ দিলেই চলবে না। বলো কে দেখেছে! কোন্ হারামজাদা দেখেছে?

—কে আবার দেখেছে, দিলীপদা দেখেছে!

—তোমার দিলীপদা তো একটা জানোয়ার।

—কী বললি?

দু'হাতে দু'কাপ গরম চা নিয়ে অরবিন্দ রেগে উঠলো। হাতে চায়ের কাপ না থাকলে কী করতো বলা যায় না। বললে—দিলীপদা কি মিথ্যে কথা বলে বলতে চাস? তাহলে তোর এই নতুন শাড়ি রোজ রোজ কোত্থেকে আসে শুনি? এই নতুন জুতো কে দেয়? তোর কলেজের মাইনে মাসে মাসে তোকে কে জোগায়?

—ও মা, দেখ, দাদা কী বলছে?

ভেতর থেকে বুড়ী মা'র গলা শোনা গেল—ওরে খোকা, আবার ঝগড়া করছিস তোরা?

অরবিন্দ রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে বললে—যাও, আর নাকি-কান্না কাঁদতে হবে না। শিরীষবাবু এক কিলো রাবড়ি কিনে দিয়েছে, খাওগে যাও। আমার কপালে কষ্ট আছে, আমি কী করবো?

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। সাত নম্বর বাড়ি ছাড়িয়ে আট নম্বরের

শোবার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকার গলিটাতে লোকজন কেউ নেই। বেশ নিরিবিলি চারদিকটা। আসলে হারান নস্কর লেনটাই সরু এক ফালি গলি। এটা আবার তারও তস্য গলি। হারান নস্কর লেনের গা থেকে বেরোন ব্লাইন্ড লেন একটা।

অরবিন্দ দু'কাপ চা নিয়ে দরজার সামনে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়ালো। পা দিয়ে ধাক্কা দিলেই দরজাটা খুলে যায়। কিন্তু কী খেয়াল হলো, জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। জানালাও ভেতর থেকে বন্ধ। অরবিন্দর জানা আছে কোথায় কোন্ ফুটোয় চোখ দিলে ভেতরের সব কিছু দেখা যাবে।

ফুটোর ভেতর চোখ দিয়ে দেখে অরবিন্দ অবাক হয়ে গেল।

কই, শিরীষবাবু তো সেই এক জায়গাতেই বসে আছে। দুজনে তো কই একটুও ঘেঁষাঘেঁষি হয়নি। সব দেখছি মাটি করবে গোপা। একটু আক্কেল-বুদ্ধি কিছছু যদি থাকে। আমি তো ঘরে নেই, আমি তোমাদের সুযোগ দেবার জন্যেই তো বেরিয়ে এসেছি আর তোমরা কি না বসে বসে ভ্যারেন্ডা ভাজছো? এই করলেই সংসার চলেছে! যত সব উজবুক নিয়ে হয়েছে সংসার। ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো কপালের মাথায়।

তারপর পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলতেই শিরীষবাবু মুখ ঘোরালো।

—কী হলো, আপনি নিজেই চা নিয়ে এলেন?

—একটু দেরি হয়ে গেল চা আনতে। কিন্তু শুধু চা নিয়ে এলাম। আর কিছু আনবো? এই সিঙ্গাড়া-টিঙ্গাড়া...

—না না, ওসব পেটে সহ্য হবে না।

—তাহলে চা খান, আমি পান-সিগারেট নিয়ে আসি—

—না না, সিগারেট আমার কাছে আছে—

অরবিন্দ বললে—তাহলে পান নিয়ে আসি, এক দৌড়ে যাবো—

শিরীষবাবু বললে—তার চেয়ে বরং আপনার সিসটারকে ডেকে নিয়ে আসুন, আলাপ করি—

—সেই আমার বোনকে খুঁজতেই তো গিয়েছিলাম স্যার, তা এখনও বাড়ি আসেনি কলেজ থেকে।

—সে কি, এত রাততির পর্যন্ত কলেজ?

অরবিন্দ বললে—আজকালকার কলেজের লেখা-পড়ার কথা আর বলবেন না স্যার, একেবারে গো-হাটা হয়ে গেছে, অথচ আমাদের সময় কত পড়ানো হত বলুন তো। আর কলেজের মাস্টারগুলো হয়েছে তেমনি অগা। তারপর কলেজ থেকে যে বাড়ি আসবে, বাসে ট্রামে তা জায়গা পাবে নাকি? ইজ্জত বাঁচিয়ে মেয়েদের বাসে চড়াই তো...

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বললে—খান, চা খান, আমি ততক্ষণ পান নিয়ে আসি, দৌড়ে যাবো আর আসবো—

বলে অরবিন্দ দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে আবার বেরিয়ে গেল।

—হেই, হেই, হেই—

ডালহৌসি স্কোয়ারের ফুটপাতের ওপর একটা বিরাটাকার ষাঁড় প্রায় গুঁতিয়ে দেয় আর কি! বুধবারি এক হ্যাঁচকা টান দিলে মেয়েটার হাত ধরে।

তার পরেই আবার পাঁঠার পা দুটো জোরে ধরে ফেললে।

—এক থাপ্পড় মেরে মাথার খাল খিঁচে দেব। বেশরম বেল্লিক বেওকুফ মেয়ে কোথাকার!

একটু আগেই বাসগাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে বুধবারির মা। রাস্তার লোকজন খুব হল্লা করে উঠেছিল। তারপর মেয়েটাও ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে বেঘোরে মারা পড়তো। খুব সামলে নিয়েছে সময় মত!

সব কাপড়ের সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে গেরো বাঁধা। পালাবার উপায় নেই। কাপড়ে হ্যাঁচ্‌কা টান পড়তেই বুড়ী মা'র নজর পড়লো এদিকে। এতক্ষণ রাস্তার জাঁকজমক-জটলা দেখছিল চোখ দিয়ে।

বললে—ক্যা হুয়া রে বুধবারি?

—দেখ না হারামীর বাচ্ছার দেমাগ দেখ না, রাস্তায় চলছে অন্ধা হয়ে। যখন গাড়ি চাপা পড়বে তখন পিলে চ্যাপটা হয়ে মরবে, বেশ হবে আচ্ছা হবে—হারামীর বাচ্ছার হুঁশ হবে—

মা বললে—ওটা কীসের মোকান রে বুধবারি? অত বড় মোকান?

বুধবারি চেয়ে দেখলে। বিজ্ঞের মত বললে—কোই ভারি সরকারী দফতর হোগা শায়েদ—

বুধবারির মা হয়ত চল্লিশ বছর আগেকার কলকাতার স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিল। তখন আদমি হরবনস্‌লালের সঙ্গে ওই বুধিয়ার মতই মাথায় ঘোমটা দিয়ে এমনি করে এই রাস্তা দিয়েই হেঁটে হেঁটে এসেছিল। অথচ এ কলকাতা যেন সে কলকাতা নয়। সব কুছ বদল গয়া। ইনসান ভি বদল গয়া। না কি উমের বেড়েছে বলে সব ভুলে গেছে।

—বেটা!

বেটা বুধবারি তখন ছোট দলটার লীডার হয়ে সামনে সামনে চলেছে। একেবারে সকলের সামনে। ফতুয়ার পকেটের ভেতর একটা দশ টাকার নোট লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। সেটা খরচ করবে না বুধবারি। কিন্তু থাকা ভাল। বিপদ-আপদ বুঝলে বার করে দেবে। আর খুচরো টাকা নয়া-পয়সাগুলো সামনে রেখেছে। গুণ্ডার শহর কলকাতা। টাকার শহর কলকাতা, আবার ভিখিরির শহরও কলকাতা। বুধবারি আসবার আগে সব জিজ্ঞেস করে নিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে এসেছে।

বাসে-ট্রামে ঝুলন্ত মানুষগুলোর দিকে চেয়ে দেখল বুধবারি। তাজ্জব মানুষগুলোর ঝোলবার তাগদ। বাবুলোগ সবাই ঝুলছে। ঝোল তোমরা। আমরা পায়দল যাবো। যন্তরপাতি বিগড়ে যেতে পারে। আমাদের পা বিগড়োবে না। আমরা হাঁটতে হাঁটতে যাবো। হেঁটে হেঁটে ফিরবো।

বুড়ী মা'রও সব দেখেশুনে তার মরদ হরবনস্‌লালের কথাগুলো মনে পড়ছিল। ওরা আমীর লোগ। আমরা গরীব। ওরা যাচ্ছে ভুখ খুঁজতে, আমরা যাচ্ছি খানা খুঁজতে।

—আরে বুধবারি? তুম ইধর কাঁহা?

হাতের মুঠোয় যেন একেবারে স্বর্গ পাওয়া গেল। দুখমোচন! জয়চণ্ডী-পুরে দুখমোচনের রিস্তাদার আছে। সেখানেই একবার গিয়েছিল দুখমোচন ছুটি নিয়ে। সেই দুখমোচন। বিরাট গোঁফ। পাকিয়ে পাকিয়ে কাঁকড়া বিছের মত দু'পাশে ছুঁচলো করে রেখেছে।

—কালিঘাটে যাচ্ছি চাচাজী।

—ওরা কারা?

—আমার বহু, বেটি আর মাতারি—

দুখমোচনের গায়ে খাঁকি উর্দি। বুকের ওপর পেতলের তকমায় দফতরের নাম খোদাই করা।

—চলো ভাইয়া, মেরা ঘর চলো, জেরা পানি ভি পিও—

এমন অসময়ে এমন ক্লান্তির পর একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া যেন কল্পনার বাইরে ছিল বুধবারির।

—আপনা মোকান্ বানায়া?

—নেহি ভাইয়া, দফতরকা কোয়ার্টার, মায় তো বিলাইতি ব্যাঙ্ককা দারবান, তিরিশ সাল ইসি কম্পনি মে কাম করতা হুঁ, কোয়ার্টার নেহি দেগা?

দুখমোচন লোকটা ভাল। কোথায় বুঝি ডিউটিতে যাচ্ছিল। দেশোয়ালি লোক পেয়ে বর্তে গেছে। একটু জলটল খেয়ে তবে যাও। কালী মাঈকী মন্দির তো কাফি দূর ভৈয়া। লগ্‌ভগ তিন ক্রোশ তো জরুর হোগা।

দল-বল রাস্তা ছেড়ে আবার চললো। বুড়ী মা আত্মীয়র নাম শুনে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছে। হরবনস্‌লালকে চিনতো দুখমোচন। আহা, ভাইয়া মারা গেছে। অফসোস কি বাত। লেকন দুনিয়ামে রহনে কি লিয়ে তো কোই আয়া ভি নেহি। সবকোই কো যানা পড়ে গা। দুখ্ মাত করো ভাইয়া। ইসকী নাম হ্যায় দুনিয়া।

নিজের ঘরে নিয়ে গেল দুখমোচন। ঘর মানে বিরাট একটা ব্যাঙ্ক-বাড়ির সিঁড়ির তলায় বাথরুম আর পায়খানার লাগোয়া একখানা চার দেওয়ালওয়ালা জায়গা। মাথার ওপর একটা ছাদও আছে।

—ইঁহা আরাম করো ভাইয়া।

বুধবারি বললে—কালিঘাটে যেতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে চাচাজী।

—আরে নেহি নেহি—হাম সব কুছু বাতা দেঙ্গে—

তা দুখমোচন লোকটা সত্যিই ভালো। বিদেশ-বিভুঁইএ এমন লোক পাওয়া ভাগ্যের কথা। লোটা করে ঠান্ডা জল আনলে কোথা থেকে। পাঁঠাটাকে উঠোনে ছেড়ে দিয়ে তাকে দুটো চানা ছড়িয়ে দিলে। বেশ জোয়ান পাঁঠা। কত কিস্মত ভাইয়া? দাম কত নিলে? বিশ রুপেয়া। বহুত সস্তা ভাইয়া। কলকাত্তামে ইসকী কিস্মত লগ্‌ভগ্ ত্রিশ রুপেয়া সে কমতি নেহি।

—তামাকু পিও গী ভাবিজী?

অর্থাৎ—বৌদি তামাক খাবে?

তামাকের বন্দোবস্তও রেখেছে দুখমোচন। বেশ ভালো করে ডাবা হুঁকোয় তামাক সেজে টিকে ধরিয়ে ধোঁয়া বার করে দিলে দুখমোচন। বুধবারির মা

ঘোমটা টেনে দিয়ে ভুড়ুক-ভুড়ুক করে হুঁকো টানতে লাগলো। রাণ্ডিয়াকে এক বাটি দুধও এনে দিলে কোথা থেকে। তারপর খইনি বানাতে লাগলো বাঁ হাতের তালুতে। তামাকটাকে টিপে টিপে গুঁড়ো করে ধুলো ঝেড়ে একভাগ দিলে বুধবারিকে আর একভাগ বুধবারির বউকে, আর একভাগ নিজের মুখে পুরে দিলে।

বললে—জেরা আরাম করো ভাইয়া—

বুধবারি পিচ ফেলে বললে—কলকাতা কেমন শহর, চাচাজী?—

দুখমোচন কলকাতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তিরিশ সাল এক নাগাড়ে এই বিলাইতি ব্যাঙ্কের দারবানি করছে। সব জানে সে। কলকাত্তা রুপেয়াকা শহর, বেইমানিকা শহর ভি। কলকাতায় আমীরও আছে, গরীবও আছে। লেকিন সকলের এক হি ধান্দা।

—কেয়া ধান্দা?

—রুপেয়া, ঔর কেয়া? সারে আদমী রুপেয়া কা পিছে লগ্ পড়া হ্যায়। রুপেয়া ঔর আওরত!

বিলিতি ব্যাঙ্কের ওপরতলায় যখন কোটি-কোটি টাকার হিসেব নিকেশ করতে ব্যাঙ্কের বাবুরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, তখন সেই ব্যাঙ্কেরই বাড়ির সিঁড়ির তলায় বসে ব্যাঙ্কের হেড-দারোয়ান টাকার নিন্দে করতে লাগলো। রুপেয়া বড় খতরনাক চিজ ভাইয়া। ফির ভি রুপেয়া কে লিয়ে আদমিলোগ দিওয়ানা বন যাতা হ্যায়।

ষাট টাকা মাইনের হেড দারোয়ান দুখমোচন ঝা সেদিন অনেক উপদেশ দিলে বুধবারিকে। বন্ধুর ছেলে, নতুন শহরে এসেছে। জীবনে প্রথম বার। গুণ্ডার খপ্পরে না পড়ে তাই এত সতর্কতা। হ্যাঁ, খুচরো টাকা-কড়ি ট্যাঁকে রাখাই ভালো। কালি-মন্দির দেবী কা স্থান। লেকিন্ পাণ্ডা লোগোঁসে হুঁশিয়ার রহনা ভাইয়া, হাঁ।

এবার ডিউটি করতে যাবে দুখমোচন। সে উঠলো।

বুধবারি বললে—ফেরবার সময় আসবো চাচাজী। মাংসর প্রসাদ নিয়ে আসবো।

ততক্ষণে তামাক খেয়ে পেটটা ঠাণ্ডা হয়েছে বুধবারির মা'র। বুধিয়াও খইনি খেয়ে গায়ে জোর পেয়ে গেছে। পাঁঠাটাকে আবার কাঁধে তুলে নিলে বুধবারি। সেও ছোলা খেয়ে একটু শান্ত হয়েছে।

—চলি চাচাজী।

—ঠিক হ্যায় ভাইয়া। বলো কালী মাঈকী জায়!

বুধবারিও বলে উঠলো—কালী মাঈকী জায়!!

কলকাতা শহরটা ঠিক যেন একটা অজগরের মত। যখন ঘুমিয়ে পড়ে তো ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু যখন কলকাতার ক্ষিধে পাবে তখন আর তাল-মাত্রা জ্ঞান

থাকবে না। বেশ আছে সব। সকাল বেলা টালার ট্যাঙ্ক থেকে কলের জল গড়িয়ে গড়িয়ে আসতে সুরু হলো। গঙ্গার জল দেওয়া আরম্ভ হলো হোস-পাইপ দিয়ে। খবরের কাগজের সাইকেল-পিওনরা কাগজগুলোকে পাকিয়ে-পাকিয়ে তিন-তলা চার-তলা পাঁচ-তলায় ওপরের ফ্ল্যাটে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে চলতে লাগলো। কাঁচা-কয়লার তোলা-উনুনগুলো ধরিয়ে রাস্তার ফুটপাতে এসে বসিয়ে দিলে গৃহস্থরা। আগের দিনের বাসি সিঙাড়া-কচুরি রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে কাকভোজন সমাধা করে পুণ্য-অর্জন করলে মেঠাই-ওয়ালারা। তখন আস্তে আস্তে শহরের মানুষের রোজকার কাজকর্ম সুরু হয়। তখন হারান নস্কর লেনের সাত নম্বর বাড়িতে অরবিন্দর বুড়ী মা আফিমের ঝোঁক কাটিয়ে এক-নাগাড়ে কাশতে সুরু করবে। সে এক বেদম কাশি। সেই কাশির শব্দের চোটেই ঘুম ভেঙে যাবে সুসীর। সে চোখ মুছতে মুছতে যাবে কলতলায়। তখন আট নম্বর বাড়ি থেকে গোপা আসবে এ-বাড়িতে। রোজকার মত উনুনে আগুন পড়বে। কোথা থেকে কতকগুলো কাক এসে এ-বাড়ির কলতলার মাথায় এসে কা-কা করে এঁটো বাসনের ছিঁটেফোঁটার দাবী জানাবে।

তারপর যখন আরো বেলা হবে, তখন রাস্তায় বাস-ট্রাম চলতে সুরু করবে। তখন পিল পিল করে লোক বেরোবে বাজারের থলি হাতে করে। এত মানুষ যে কোত্থেকে আসে তা বোধ হয় কলকাতা নিজেও বলতে পারে না। কোথা থেকে এরা আসে আর কোথায় যে যায় তা কলকাতা অনেক মাথা ঘামিয়েও ঠিক করতে পারে না।

ওই যে বুধবারি একটা পাঁঠা কাঁধে করে নিয়ে আসছে হাওড়া ময়দান থেকে ওরা আদিকাল থেকে আসছে এমনি করে। ওই যে শিরীষবাবু বিরাট গাড়িখানা থেকে নেমে হারান নস্কর লেনের অন্ধকার ব্লাইন্ড গলিটার মধ্যে গিয়ে হারিয়ে গেল, ওই বা কেন হারিয়ে গেল তাও কলকাতা জানে না। আর শুধু কি ওরা? ওই 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভান্ডারে'র দিলীপ বেরা টাকার বান্ডিল নিয়ে বসে বসে কীসের মতলব আঁটছে সারাদিন তাও কেউ বলতে পারে না। আর তারপর রাস্তার ওপর যেখানে মিছিলের লোকগুলো বেকার নিষ্কর্মার মত লাল-নীল ফেস্টুন নিয়ে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলে চেঁচাচ্ছে ওরাই বা কীসের আকর্ষণে কার প্রতিবাদ করতে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে তা ওরা হয়ত নিজেরাও জানে না।

তা না জানুক, কিন্তু সেই অনাদিকাল থেকে কলকাতা বরাবর সেই একই দৃশ্য দেখে আসছে, আজও দেখছে। আজও দেখছে সাত নম্বর হারান নস্কর লেন থেকে সুসী বেরোল সেজেগুজে। কোথা থেকে যে ওর রোজ নতুন নতুন শাড়ি জুতো আসে তা ওর দাদা ওর মা ওর বৌদি কেউই বলতে পারে না। সুসীও তা জানাতে চায় না।

বাসে যখন ওঠে তখন ওর পিঠে বেণী ঝোলে, হাতে থাকে একখানা একসার-সাইজ-বুক। ওখানা কলেজে প্রফেসারের নোট টুকে নেওয়ার খাতা। আর থাকে একটা পেটমোটা ভ্যানিটি-ব্যাগ।

কিন্তু বাসে চলতে চলতে কত কলেজের গেট পেরিয়ে যায়, তবু সুসী নামে না। নামে একেবারে পূর্ণ থিয়েটারের সামনে। তারপর টুক করে পুব দিকের

একটা সর্পিল গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। দুপাশে দুতলা তিনতলা সব বাড়ি। গলিটা এঁকেবেঁকে কোন্ দিকে যে মোড় ফিরে কোন্ রাস্তায় গিয়ে মেশে তা মাঝে মাঝে গলির আদিবাসিন্দারাও বলতে পারে না। কিন্তু সুসী জানে কোথায় তাকে যেতে হবে।

তিনতলা একখানা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে সুসী। তারপর পাশের গলিটা দিয়ে খানিকটা ঢুকলেই একটা সিঁড়ি পাওয়া যাবে। সেই সিঁড়ি দিয়ে একেবারে তিনতলায় চলে যাও। সেখানে কলিং বেলের বোতাম আছে, সেইটে টেপো। টেপবার সঙ্গে সঙ্গে কেউ কিছু উত্তর দেবে না। একটা ফুটোতে মোটা কাচ লাগানো আছে। সেখান দিয়ে ওপাশ থেকে কেউ উঁকি মেরে তোমাকে দেখবে। যদি দেখে তুমি তার চেনা লোক তাহলে হুট করে দরজা খুলে দেবে বেণুদি।

বেণুদি বললে—কী রে, তুই? এত সকাল সকাল?

বেণুদির যে টাকা-পয়সা প্রচুর আছে তা ঘরের ভেতরকার আসবাবপত্র দেখলেই বোঝা যাবে। সুসী বললে—বেণুদি, তোমার কাছে এলাম—

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, এসেছিস ভালো করেছিস, তা তোর মুখটা এত শুকনো কেন রে?

সুসী বললে—কালকে যে লোকটার সঙ্গে তুমি আমায় পাঠালে বেণুদি, সে ভালো লোক নয়—

—নিখিল? কেন, কী করলে?

সুসী বললে—কথা ছিল আমি শুধু তার সঙ্গে সিনেমা দেখবো, আর কিছু করবো না, তা সিনেমা ভাঙলো সন্ধ্যে ছটার সময়, তখন কী বলে জানো? বলে—লেকে চলো—

বেণুদি বললে—ওমা তাই নাকি?

সুসী বললে—হ্যাঁ, তা আমি বললাম, লেকে যাবার তো কথা ছিল না। ফুরণ হয়েছিল শুধু তার সঙ্গে সিনেমায় যাবো, সব খরচ-খরচা বাদে আমায় দশটা টাকা দেবে। আমার যা রেট! কী বলো?

বেণুদি বললে—তা তো বটেই, তারপর?

—আমি বললাম লেকে গেলে ঘণ্টা পিছু আরো দশ টাকা দিতে হবে। শেষকালে লেকে নিয়ে গিয়ে অন্ধকারে কী করবে কে জানে! তখন মরি আর কী! আমার খুব ভয় হয়ে গেল বেণুদি। তখন তোমার নিখিল বলে কি জানো? বলে কাছে টাকা নেই, পরে দেবো। তা এ-সব কারবার কি বাকিতে চলে? তুমিই বলো না বেণুদি! এতই যদি মেয়েমানুষের নেশা তো পকেটে টাকা নিয়ে বেরোলেই পারো? আমি স্পষ্ট কথার মানুষ!

—তা, তুই কী করলি?

—তখন বলে কি জানো? বলে—আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি, ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। বলে—চলো একটা হোটেলের ঘর ভাড়া করে দুজনে এক সঙ্গে রাত কাটাই। আমি বললুম, অমন ভালবাসার মুখে আগুন। অত ভালবাসা দেখাতে গেলে টাকা ফেলতে হয়।

তারপর একটু থেমে বললে—তারপর কী করলে জানো? আমার গায়ে হাত দিয়ে টানাটানি করতে লাগলো।

—সে কী? তুই গালে চড় কষালি না কেন একটা?

সুসী বললে—আমি ভাবলুম তোমার ক্লায়েণ্ট, শেষকালে হয়ত তুমি শুনে রাগ করবে।

—ছাই, রাগ করবো কেন? আমার সঙ্গে এক-রকম কনট্র্যাক্ট করে নিয়ে গিয়ে কথার খেলাপ? এ তো ভালো কথা নয়। না না মেয়ে, তুই ঠিক করেছিস। এবার এলে নিখিলের মুখে জুতো ঘষে দেবো। ছি ছি, আমি এতদিন কারবার করছি, এমন ছোটলোকের মত ব্যবহার তো কারো দেখিনি। এবার এলে সাফ বলে দেবো, যদি এই রকম প্রবৃত্তি হয় তোমার তো তুমি সোনাগাছি-চিৎপুরে যাও বাছা, সেখানে ও-সব ইল্লুতেপনা চলবে। আমার মেয়েরা ভদ্দরঘরের গেরস্থ মেয়ে, পেটের দায়ে সখ করে একটু ফুর্তি করছে বলে ভেবো না তারা চরিত্র নষ্ট করবে।

সুসী বললে—আমিও তো তাই বললাম—

—শুধু তুই কেন, আমিও তো আমার ছেলেদের সকলকে তাই বলি। বলি, এ তুমি সোনাগাছি-চিৎপুর পাওনি বাবা। এখানে আমার মেয়েরা কারবার করতে আসে বলে ভেবো না টাকার জন্যে তারা ইজ্জৎ দেবে। দুটো পয়সা জমিয়ে একদিন আমার মেয়েরাও জমি কিনবে বাড়ি করবে, বিয়ে-থা করবে, সংসার করবে

তারপর একটু থেমে বললে—খেয়ে এসেছিস তো?

—হ্যাঁ বেণুদি। কলেজ যাবার নাম করে একেবারে ভাত খেয়েই বেরিয়েছি।

—বেশ করেছিস। আয় বোস,—বলে বেণুদি জোরে পাখাটা খুলে দিলে।

বেণুদির ঘরে যারা আসে তাদের আদর-আপ্যায়নের এলাহি বন্দোবস্ত আছে। খবরটা ওয়াকিবহাল যারা, তারা জানে। জানে বলেই বেণুদির ক্লায়েণ্ট মহলে সুনাম আছে। তবু একটা-কি-দুটো ব্যতিক্রম হলে বেণুদি ভীষণ চটে যায়। আজ এই আঠারো বছর বেণুদি এই কারবার চালাচ্ছে, অনেক রকম বে-আইনী কাণ্ড বাধিয়েছে ক্লায়েণ্টরা। কিন্তু সকলকে শক্ত হাতে শায়েস্তা করেছে বলেই আজ বেণুদির এত পসার।

বেণুদি বলে—সেইজন্যেই তো ব্ল্যাকমার্কেটারদের আমি ঢুকতে দিই না বাছা আমার বাড়িতে। আমি বলি তুমি যদি স্টুডেন্ট হও তো আমার বাড়িতে এসো, আমার ছেলেরাও সব স্টুডেণ্ট, মেয়েরাও তাই—

সুসী বললে—তা তোমার নিখিল কি স্টুডেন্ট নাকি?

বেণুদি বললে—বলে তো স্টুডেণ্ট, আমি তো আর কলেজে গিয়ে রেজিস্ট্রি-খাতা দেখে আসিনি। মানুষের কথায় বিশ্বাস করেই আমি এখানে ঢুকতে দিই—

—ওইটেই তো তুমি ভালো করো না বেণুদি! আজকাল কি আর মুখের কথায় কাউকে বিশ্বাস করা যায়?

—ঠিক বলেছিস মা, ঠিক বলেছিস। দিনকাল সব পালটে গেছে মা, সব পালটে. .

বলতে বলতে কথায় বাধা পড়লো। টেলিফোনের রিসিভারটা বেজে উঠলো পাশের ঘরে। বেণুদি ধরতে গেল দৌড়ে।

তারপর বেণুদির গলা শোনা গেল—হ্যালো—কে? সমীর? কী খবর বাবা? এতদিন দেখা নেই কেন? বেণুদিকে একেবারে ভুলে গেলে নাকি বাবা?

তারপর কিছুক্ষণ চুপ। অনেকবার হাঁ-হু-না চললো। শেষকালে বললে—আসবে? তা এসো-না বাবা! বেণুদির কাছে আসবে তার আবার লজ্জা কীসের!

সুসী কান খাড়া করে রইল।

—আছে, আছে। আমি যখন আছি, তখন কিছু ভাবনা নেই তোমার বাবা। মেয়ে? হ্যাঁ এক মেয়ে তো আমার কাছেই বসে রয়েছে এখন! সুসী। আমার সুসীকে চেন তো? হ্যাঁ থার্ড ইয়ারে পড়ে। রাত দশটা কোরো না বাবা। তা তুমি এসো, এলে তখন কথা হবে—আচ্ছা রেখে দিলাম—

ফোন ছেড়ে দিয়ে বেণুদি হাসতে হাসতে এ-ঘরে এল।

বললে—ভালই হয়েছে রে, তুইও ঠিক সময়ে এসে গেছিস—

সুসী জিজ্ঞেস করলে—কে বেণুদি?

—সমীর রে, সমীর। সমীরকে চিনিস না? খুব বড়লোকের ছেলে। বাপ গেজেটেড অফিসার, দিন-রাত লণ্ডন-আমেরিকা করছে, তারই ছেলে। তোর সঙ্গে মানাবে ভাল!

সুসী বললে—কিন্তু টাকা?

—টাকা তুই যা চাইবি তাই।

সুসী বললে—শুধু সিনেমা দেখা, না হোটেলে যেতে হবে?

—এই তোর বড় দোষ একটা, এই তোর বড় দোষ! আগের থেকেই টাকা টাকা আর টাকা। আগে আসুক, কথাবার্তা বল, মানুষটা কী রকম দ্যাখ, তবে তো?

সুসী বললে—মানুষ দেখে আমার কী হবে বলো তো বেণুদি। আমি তো মানুষটাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না। সে যখন করবো, তখন করবো। এখন আমার টাকা নিয়ে দরকার—

—কেন বল দিকিনি? তুই কলেজে পড়িস, তোর এত টাকার খাঁকতি কেন বল তো?

—বাঃ, টাকার দরকার নেই? তুমি বলছো কী? একটা ভদ্দরগোছের শাড়ি কিনতে গেলে কত টাকা লাগে আজকাল বলো তো? তিরিশ টাকার কমে এক-জোড়া জুতো হয়? তারপর বাড়ি ভাড়া আছে, চাল-ডাল-তেল-নুন, মা' রাবড়ি, তবু তো মা'র চশমা একটা করে দিতে পারছি না। আমার কি বাবা আছে, না বাবার জমিদারি আছে?

—তা তোর দাদাটা এখন কী করে? এখনও সেই রকম ভ্যারেণ্ডা ভাজছে নাকি?

—দাদার কথা আর বোল না। বাড়িতে কেবল বন্ধু-বান্ধব আনছে, আর আমার পেছনে লাগছে। কেবল আমাকে নিয়ে টানাটানি। আমায় খাটিয়ে বড়লোক হতে চায়।

বেণুদি বললে—না না, দাদার খপ্পড়ে পোড় না। নিজে গতর দিয়ে যে-কটা টাকা উপায় করছো একটা পোস্টাপিসের বই করে জমাও, তাতে আখেরে নিজের ভাল হবে। শেষে একটা তেমন সুবিধে দরে যাদবপুরের দিকে জমি কিনে বাড়ি-টাড়ি করো। তারপর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে কত ভালো-ভালো বর জুটবে তোমার। চাই কি, আমার সন্ধানে কত ভাল পাত্র আছে, আমি নিজে সম্বন্ধ করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার বিয়ে দিয়ে দেবো—

সুসী বললে—আমারও তো সেই মতলবই আছে বেণুদি, সেইজন্যেই তো এত টাকা টাকা করি—

বেণুদি বললে—তাহলে ততক্ষণ একটু আমার বিছানায় গড়িয়ে নে তুই, সমীর

আবার দু'টোর মধ্যেই আসবে বললে। একটা শাড়ি দিচ্ছি, ওটা পরে শুসনে, নট-ঘট হয়ে যাবে তোর মুর্শিদাবাদীটা। তারপর সে আসবার আগেই মুখ-হাত ধুয়ে পাউডার স্নো-ক্রীম মেখে সেজে-গুজে থাকবি, চল—

সুসী ড্রইং রুম থেকে বেণুদির শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র দিলীপদা দূর থেকে দেখতে পেয়েছে।

—কী রে অরবিন্দ, কোথায় চলেছিস?

—এই একটু 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' করে আসছি দিলীপদা!

—তোর আবার মরতে এ শখ হলো কেন?

অরবিন্দ বললে—না দাদা, এই কেলো-ফটিক ডাকলে।

কেলো-ফটিক পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

দিলীপদা বললে—কী রে কেলো-ফটিক, ওকে আবার দলে টানলি কেন?

—এই দেখ না দিলীপদা, এই এত বেলায় মাংস কিনতে যাচ্ছিল হাতে থলি নিয়ে। তাই দেখে বললুম, আমাদের সঙ্গে আসুন, নইলে দু'দিন বাদে মাংস তো মাংস, ভাতই জুটবে না কপালে।

ওদিক থেকে লীডার গোছের কে একজন চিৎকার করে উঠলো—বলো ভাই ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

—জিন্দাবাদ।

কংগ্রেস সরকার জবাব দাও—

দিলীপ বেরা হাসতে লাগলো। চিৎকারটা থামলে অরবিন্দকে বললে—কখন ফিরছিস?

অরবিন্দ বললে—কেলো-ফটিক বলছে বেলা বারোটা-একটার মধ্যেই ফিরতে পারবো। আসবার সময় পাঁচ নম্বর বাসে আসবো—

—খাওয়া?

অরবিন্দর হয়ে জবাব দিলে কেলো-ফটিক। বললে—পার্টি থেকে পাঁউরুটি-চা'র বন্দোবস্ত আছে—আর তাছাড়া একটা দিন না-খেলে কী হয় দিলীপদা? সারা বাঙলাদেশ উপোস করছে মাসের পর মাস, আর আমরা সেই বাঙালীসন্তান হয়ে একটা বেলা উপোস করতে পারবো না?

—কর উপোস।

বলে দিলীপদা চলেই যাচ্ছিল। পেছন থেকে ডাকলে অরবিন্দ।

—তোমার কাছে যাবো বলেই বেরিয়ে ছিলাম দিলীপদা—

—কেন রে? আমার কাছে আবার কী দরকার? টাকা?

অরবিন্দ লাইন থেকে বেরিয়ে এসে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললে—আসলে মাংস কিনতে বেরিয়ে ছিলাম দিলীপদা, এই দেখ, হাতে থলি রয়েছে—

—তা মাংস না কিনে হুজুগ করছিস কেন?

—মাংস যে কিনবো তার টাকা কোথায়? ছ'টাকা কিলো। তাই ভাবছিলাম যদি তুমি গোটা দশেক টাকা দিতে।

দিলীপদা বললে—টাকা নেই তো আবার মাংস খাবার শখ কেন শুনি?

—না দিলীপদা, সত্যি কথা বলছি, আমার নিজের জন্যে নয়। বউটার শরীরটা দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ভালো মন্দ খাওয়াতে পারছি না তো। তাই।

—আগের টাকা এখনও তোর কাছে পাই আমি তা খেয়াল আছে?

—সে আমি দোব, মোটামতন একটা টাকা পেলেই তোমার সব টাকা এক থোকে শোধ করে দেবো। মাইরি বলছি দিলীপদা, আমি তোমার টাকা মেরে দেবো না—

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে পরে শুনবো'খন, এখন তুই আগে ঘুরে আয়—বলে দিলীপদা চলে গেল নিজের দোকানের দিকে।

মিছিলটা এবার ছাড়বে। অরবিন্দ নিজের জায়গায় গিয়ে আবার দাঁড়াল। যা থাকে কপালে একটা কিছু হয়ে যাক। হয় এসপার নয় ওসপার। আর কিছু ভাল লাগে না অরবিন্দর। ধার-দেনা করে আর কাঁহাতক চালানো যায়! সব লন্ডভন্ড হয়ে গেলে বোধ হয় একটা সুরাহা হতো। কেলো-ফটিক বলে ঠিক। সমস্ত কলকাতাটা যদি একবার উল্টে দিতে পারা যেত তো বাঁচা যেত। মানে বড়লোকের পাড়াটা যদি এখানে চলে আসতো, আর এ-পাড়াটা বড়লোকদের পাড়ায়। সোজা অবস্থায় সে রকম তো হবার যো নেই। শিরীষবাবুর ব্যাপারটাই দেখ না। অত বড় একটা টাকাওয়ালা লোক, সেও বেশি দিন ভিড়লো না।

অথচ কত তোয়াজ তাকে করেছে অরবিন্দ। নিজের হাতে তাকে চা করে দিয়েছে প্রথম দিনটা। আবার দৌড়ে মোড়ের বেনারসীলালের দোকান থেকে পান কিনে নিয়ে এসেছে।

মনে আছে বাইরের জানালার ফুটো দিয়ে অরবিন্দ উঁকি মেরে দেখছিল। সেই ঠিক তেমনি জরদ্গবের মত বসে আছে। আরে বাবা, একটু গায়ে হাত দে। পাশাপাশি দুজনকে বসিয়ে দিয়ে চলে গেলুম, দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলুম, কেউ কিছু বলবার নেই, দেখবার নেই, পরের বউ, ভয় করবার দরকারটা কী? আর আমি তার স্বামী হয়ে যখন বলছি, তখন লজ্জা-সরমটা কী? তা নয়, কেবল সিসটার আর সিসটার? কেন, গোপা কি খারাপ দেখতে? একটু রোগা-পটকা, এই যা। ওই গোপারই গায়ে একটু মাংস চাপিয়ে দিলে কত লোক পাগল হয়ে লুফে নেবে যে।

সেইজন্যেই তো মাংস কেনার কথাটা ক'দিন ধরে ভাবছিল অরবিন্দ। গোপাকে আর একটু মাংস-টাংস কি ঘি-দুধ-ডিম খাওয়াতে পারলেই আর ভাবনা নেই। তখন ওই সুসীকে আর খোসামোদ করতে হবে না। ওই গোপাকে দেখিয়েই লাখ-লাখ টাকা উপায় হবে। সেই টাকাতে বাড়ি হবে, গাড়ি হবে। তখন সুসী এসে খোসামোদ করবে দাদাকে। তখন অরবিন্দ লাথি মেরে দেবে তাকে। বলবে—এখন কেন? এখন কেন দাদাকে খোসামোদ করতে আসছিস শুনি? সেই সব দিনের কথা মনে নেই? কতদিন বলেছি একটু খাতির কর আমার বন্ধুদের, একটু হেসে কথা বল, একটু সিনেমায় যা ওদের সঙ্গে, লেকের দিকে গিয়ে একটু বেড়িয়ে আয়, তখন তো শুনিসনি আমার কথা। তাহলে এখন কেন এসেছিস আমার বাড়িতে খোসামোদ করতে।

পান কিনে নিয়ে এসে আবার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলে অরবিন্দ।

শিরীষবাবুর তখন চা খাওয়া হয়ে গেছে। গোপাও সব চা'টা শেষ করে দিয়েছে।

শিরীষবাবু বললে—আপনার বুঝি খুব বই পড়ার শখ?

গোপা বললে—না শখ নয়, কোন কিছু কাজ ছিল না বলেই বইটা উল্টোচ্ছিলুম—

—কী বই, দেখি!

বইটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে গোপা বললে—শ্রীকান্ত—

—শ্রীকান্ত? ঠাকুর-দেবতার বই বুঝি?

—না, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা।

—শরৎ চট্টোপাধ্যায়? কোথাকার লোক? ইস্ট বেঙ্গল? বাঙাল?

—আপনি শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের নাম শোনেননি?

শিরীষবাবু বইখানা নিয়ে নাড়তে-চাড়তে বললে—না, ঠাকুর-দেবতার ওপর আমার ভক্তি-টক্তি নেই, আর সে-সব যখন বুড়ো হবো, তখন পড়বো। এখন সিনেমা দেখবার বয়েস—

তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। বললে—অরবিন্দবাবু কোথায় গেলেন—

—উনি আপনার জন্যে পান কিনে আনতে গেলেন।

—পান কিনতে এত দেরি? অনেক দূরে বুঝি পানের দোকান?

গোপা হাসলো। বললে—না—

শিরীষবাবু বললে—হাসছো কেন?

—হাসছি আপনার কথা ভেবে।

—কেন, আমি কী করলুম!

—আপনি ভাবছেন উনি এখনি আসবেন?

শিরীষবাবু বললে—কেন, দেরি হবে?

—হ্যাঁ, দেরি হবে।

শিরীষবাবু বললে—দেরি হবে? কত দেরি হবে?

গোপা আবার মুচকি হাসলো। বললে—অনেক দেরি হবে, এক ঘন্টার আগে নয়।

শিরীষবাবু কী করবে বুঝতে পারলে না। অরবিন্দবাবুর একটা বোন আছে বলেছিল দিলীপ বেরা। 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র দিলীপ বেরাই আসলে যোগাযোগটা করে দিয়েছিল। কিন্তু সেটাকে বার করছে না সামনে। এদের মতলব খারাপ বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ মনে হলো দরজার পাল্লা যেন ঈষৎ ফাঁক হলো। তারপর মনে হলো বাইরে থেকে কে যেন উঁকি মারছে। শিরীষবাবু অবাক হয়ে গেল।

—কে?

আর তারপরেই চিনতে পারলে। অরবিন্দ। অরবিন্দই দরজাটা ফাঁক করে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

অবাক হবার কথাই বটে। ঘরে না ঢুকে বাইরে থেকে ডাকার কী মানে?

শিরীষবাবু দরজাটা খুলে বাইরে যেতেই দেখলে, যা ভেবেছে তাই। অরবিন্দ দাঁড়িয়ে আছে হাতে পানের খিলি নিয়ে।

শিরীষবাবুকে পানের খিলিটা দিয়ে মুখটা তার মুখের কাছে এনে বললে—হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন?

শিরীষবাবু পানটা মুখে পুরে বললে—বসে থাকবো না তো কী করবো?

অরবিন্দ গলাটা আরো নিচে নামিয়ে ফিসফিস করে বললে—কেন, কিস্-টিস্ খান—

হঠাৎ ওদিক দিয়ে আরো জোরে চিৎকার উঠলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

সবাই মিলে এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

পাশ থেকে কেলো-ফটিক বললে—কী অরবিন্দবাবু, কী ভাবচেন? চেঁচান—সস্তা দরে খাদ্য চাই—

অরবিন্দর তখন ভাবনার ঘোর কেটে গেছে। বলে উঠলো—সস্তা দরে খাদ্য চাই—

—মজুতদারের শাস্তি চাই—

সকলের সঙ্গে এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে অরবিন্দও বলে উঠলো—মজুতদারের শাস্তি চাই—

বহুদিন আগে একদিন জঙ্গল ছিল ওখানে। পাশেই ছিল গঙ্গা। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ওই গঙ্গার ধারেই বেশ নিরিবিলি জায়গা দেখে ইণ্ডিয়ান ভাইস্-রয়ের জন্য ওই প্যালেসটা বানিয়েছিল। তখন ওর নাম ছিল 'ভাইসরয়েস প্যালেস'। তারপর ১৯১১ সালে যখন ইণ্ডিয়ার ক্যাপিটেল দিল্লীতে চলে গেল তখন ওর নাম হলো 'গভর্নরস হাউস'।

ততদিনে গঙ্গা সরে গেছে। কলকাতার বুকে 'ইউনিয়ান-জ্যাক বেশ মজবুত করে খুঁটি গেড়েছে। কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে ব্রিটিশ-এম্পায়ারের খুঁটি কখন যে আলগা হয়ে এল, তার নিজের দেশের দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের বাড়িতেই তা কেউ দেখতে পায়নি। সেখানেই একদিন দেখা গেল বোমা পড়ছে মাথার ওপর, মাটি সরে যাচ্ছে পায়ের তলায়। তখন পালাও পালাও রব উঠলো নিজের দেশে। ছাড়তে হলো ইণ্ডিয়া, বার্মা, সিলোন, সিঙ্গাপুর, মালয়, ঘানা, আফ্রিকা... ছাড়তে হলো এশিয়ার এম্পায়ার।

কলকাতায় কংগ্রেসের মীটিং বসলো। তারা বললে—ইংরেজ, ইণ্ডিয়া ছাড়ো—কুইট্ ইণ্ডিয়া—

ইণ্ডিয়া তো ছাড়তেই তারা তৈরি, তবে আর নতুন করে মীটিং করবার কী দরকার?

কিন্তু না, যেতে যখন হবেই তখন একটা চিহ্ন রেখে যাবো যা দেখে চিরকাল আমাদের কথা মনে পড়বে।

—সেটা কী জুডি?

জুডি হবসন-এর জন্ম হয়েছিল নটিংহামশায়ারে। পোস্ট-ওয়ার যুগের ইংলিশম্যান। যখন লণ্ডনে হিটলারের বোমা পড়ছিল তখন বয়েস খুব কম।

একটু-একটু মনে আছে সে-সব কথা, খুব অস্পষ্ট সে-সব স্মৃতি।

নতুন বিয়ে করে বউ নিয়ে এককালের পৈতৃক জমিদারিতে বেড়াতে এসেছে। যে-হোটেলটায় উঠেছে, চৌরঙ্গীর অনেকখানি জায়গা জুড়ে তার পরিধি। বাইরের টুরিস্ট-ট্রাফিক ওই হোটেলেই এসে ওঠে। ক্যালকাটা বললেই টুরিস্টের দল বলে স্ট্র্যান্ড্ হোটেল!

স্ট্র্যান্ড্-হোটেল এমনিতেই সারা সিজন জম-জমাট থাকে। এবার টুরিস্ট বেশি এসেছে। অন্য সকলের সঙ্গে এসেছে জুডি হবসন। আর তার নতুন বিয়ে করা বউ ক্লারা। ক্লারা ডেনহ্যাম।

স্ট্র্যান্ড্ হোটেলের ভেতরে সব সময় আটকে থাকা যায় না। ভেতরে ঠাণ্ডা-ঘরে থেকে বাইরের ক্যালকাটাকে দেখতে পাওয়া যায় না স্পষ্ট করে। তাই লাঞ্চের পর জুডি হবসন স্ট্র্যান্ড হোটেলের আর্কেডের ছাদে দাঁড়িয়ে নিচের রাস্তার দিকে ঝুঁকে দেখছিল।

পাশে ছিল নতুন বিয়ে করা বউ ক্লারা।

ক্লারা বললে—কী ফেলে গেছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট?

—ওয়ান-আইড ক্যাননন—

—তার মানে?

—একচক্ষু কামান। কালকে গভর্নরস হাউসের গেটের সামনে যে-কামানটা দেখলে ওটার একটা চোখ!

—তুমি জানলে কী করে জুডি?

জুডি হবসন অনেক জানে। ইণ্ডিয়ায় না এসেও অনেক কথা জেনে গেছে, অনেক কথা শিখে গেছে। আগের দিন হলে এই জুডি হবসনই এখানে হয়তো আই-সি-এস অফিসার হয়ে আসতো। এসে হয়ত ওই গভর্নরস হাউসে এসে উঠতো। তারপর ডিফেন্স-অফ-ইণ্ডিয়ার অ্যাক্টে এই ইণ্ডিয়ানদেরই অ্যারেস্ট করতো।

ছাদের প্যারাপেট ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগা-পাশ-তলা দেখতে লাগলো জুডি। জুডি আর তার নতুন বিয়ে করা বউ ক্লারা। দিস ইজ ক্যালকাটা। দিস ইজ ইণ্ডিয়া। জুডির পূর্বপুরুষদের এম্পায়ার। এই ক্যালকাটা থেকেই একদিন কোটি কোটি পাউন্ড ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হয়েছে, নটিং-হামশায়ারের ক্ষেতে খামারে বাড়িতে গিয়ে ঐশ্বর্য জুগিয়েছে। আজ সমস্ত লস্ট। ইণ্ডিয়া এখন সেই লস্ট এম্পায়ার।

—লুক, লুক! দেখ দেখ জুডি দেখ! সমস্ত কলকাতাটাই এখান থেকে দেখা যায়। এই ছাদ থেকে। রাস্তা দিয়ে বাস চলেছে, ট্রাম চলেছে, মানুষ চলেছে আর চলেছে গাড়ি। আর তার ওপরে ঘাস ভর্তি মাঠ। আর তারও ওপাশে অক্টারলোনী মনুমেন্ট। আনকেল হবসন ছিল ইণ্ডিয়ার মিলিটারি সেক্রেটারি। ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে সব কথাই জানতো কাকা। আনকেল ছুটিতে যখন দেশে যেত তখন গল্প করতো ইণ্ডিয়ার। বড় আলসে জাত এই ইণ্ডিয়ার নেটিভরা, ঝগড়াবাজ। যদি ইণ্ডিয়া স্বাধীন করে দেওয়া হয় তো সব গোলমাল করে ফেলবে। মোস্ট ব্যাকওয়ার্ড রেস। এখন ইণ্ডিপেনডেন্ট হয়েছে এই কান্ট্রি। এখন ইণ্ডিপেনডেন্ট ইণ্ডিয়া দেখতে এসেছে আনকেল হবসনের ভাইপো।

—কিন্তু এক-চক্ষু কামানটা রেখে দিয়ে গেল কেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট? হোয়াই?

জুডি হবসন বললে—আনকেল জানতো একদিন এই গভর্নরস-হাউসের সামনেই আবার গুলি চালাতে হবে নেটিভ গভর্নমেন্টকে। জানতো নিজেরা নিজেদের মধ্যে ফাইট করবে! আমার আনকেল বলতো, নেটিভরা গভর্নমেন্ট চালাতে পারবে না।

—হাউ সিলি!

ক্লারা ডেনহ্যাম সুন্দরী মেয়ে। হাসলে গালে টোল পড়ে। কাল সকালে নেমেছে দমদম এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে ভি-আই-পি রোড ধরে সোজা চলে এসেছিল এই হোটেলে। ন্যাস্টি হোটেল আর ন্যাস্টি সিটি। এই সিটিরই গর্ব করতো তোমার আনকেল? কিন্তু হোয়াই সো ডার্টি টাউন? কেন এত নোংরা? কাল টাউনটা ঘুরে ঘুরে দেখে এসেছে দুজনে। বড় পুওর পিপল সব। পুওর কান্ট্রি। এই নাকি এককালে ছিল সেকেন্ড সিটি ইন দি ব্রিটিশ এম্পায়ার! হিজ মেজেস্টিজ প্রাইড।

—লুক, লুক জুডি, হোয়াটস্ দ্যাট? ওটা কী?

জুডি হবসন আর দেরি করলে না। হাতের ক্যামেরাটা নিয়ে নিচেয় রাস্তায় ফোকাস করতে লাগলো! ভেরি বিউটিফুল পিকচার!

—বাট, হোয়াটস্ দ্যাট? ওটা কী জুডি?

জুডি হবসনের আনকেল এই ইন্ডিয়াতেই এখানকার গভর্নরের মিলিটারি সেক্রেটারি ছিল। অনেক গল্প করেছে আনকেল, কিন্তু এরকম গল্প করেনি। এ-ছবির অনেক দাম হবে। অনেক দামে বিক্রি হবে কনটিনেন্টে।

স্ট্র্যান্ড হোটেলের একজন ওয়েটার-বয় ঘরের ভেতরে কাজ করছিল। তাকেই ডাকলে জুডি। কাম হিয়ার, এদিকে শোন। হোয়াটস্ দ্যাট? ওটা কী?

বহুদিনের পুরোন কর্মচারী গুণধর। গুণধর তিরিশ বছর ধরে এই হোটেলের সাহেব-সুবাদের সেবা করে আসছে। সাদা চামড়ার মেমসাহেব দেখেই সেলাম করলে। তারপর ছাদের প্যারাপেটের কাছে এগিয়ে এসে নিচের রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলে।

—কই? কোনটা হুজুর?

—দেয়ার, দেয়ার—

গুণধর এক মুহূর্তেই বুঝে নিলে ব্যাপারটা। বললে—ও কিছু না হুজুর। পাঁঠা। পাঁঠা কাঁধে করে নিয়ে কালিঘাটে যাচ্ছে।

—কালিঘাট? হোয়াটস্ দ্যাট?

—গডেস মা-কালী হুজুর। ওখানে এই পাঁঠাটাকে বলি দিলে মনোবাসনা পূর্ণ হবে ওদের!

জুডি হবসন কী বুঝলো কে জানে। স্ট্রেঞ্জ! এ স্ট্রেঞ্জ সাইট! বাট ভেরি বিউটিফুল।

নিচের রাস্তায় তখন বুধবারি নিজের মনেই উত্তর থেকে দক্ষিণে চলেছে। কাপড়ের খুঁটে সকলকে বাঁধা আছে। হোটেলটার কাছে আসতেই পেছন থেকে বুড়ী মা জিজ্ঞেস করলে—আরে বুধবারি, এ কেয়া মোকান রে? ইসমে কেয়া

হোতা হ্যায় ?

বুধবারি মাথাটা ঘুরিয়ে মোকানটা একবার দেখে নিলে ভালো করে। দেখলে, ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে দুজন সাহেব-মেম তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। মা'র কথায় বিরক্ত হয়ে উঠলো বুধবারি।

বললে—থাম বুঢ়িয়া, চুপ রহো—

তবু বুড়ী থামে না। অবাক হয়ে দেখে বাড়িটাকে। একেবারে এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত। এত বড় মোকান কিস্‌কা? কলকাতার জমিনদার হবে বেশখ!

বুধবারি বললে—নেহি, এ ভারি দফতর, সাহাব-লোগকা দফতর।

সাহেবরা যে হিন্দুস্থান ছেড়ে সাগরপারে কবে পাড়ি দিয়েছে বুধবারিদের সে খবর রাখবার দরকার হয় না। খবরটা বলে সে চলতে আরম্ভ করেছে সামনের দিকে। মা-কালীর মন্দিরের দিকে।

জুডি হবসন ততক্ষণে ছবি তুলে নিয়েছে ইণ্ডিয়ার। ইণ্ডিয়া আর ইণ্ডিয়ার বুধবারির। কড়া দামে সে ছবি বিক্রি হবে। লণ্ডন নিউ-ইয়ার্ক ওয়েস্ট-জার্মানীর বাজারে রিয়্যাল-ইণ্ডিয়ার ছবির দাম আছে খুব।

কিন্তু যে ছবি তুললে আসল ইণ্ডিয়ার আরো পরিচয় পাওয়া যেত সে ছবি জুডি হবসন তুললো না। ওই হোটেলের ভেতরেই কাল তোলবার মত অনেক ছবি দেখেছে জুডি হবসন আর ক্লারা ডেনহ্যাম। সারা দুনিয়া দেখবে বলেই তারা হাওয়াই-জাহাজে উড়ে বেড়াতে বেড়াতে ইণ্ডিয়াতে এসে ঠেকেছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ার মাটির তলায় যে সুড়ঙ্গ আছে, আর সেই সুড়ঙ্গের ভেতরে যে ষড়যন্ত্র চলেছে তার সন্ধান পেলে না নটিংহামশায়ারের সেই যুগল-টুরিস্ট্। যদি সন্ধান পেত তো আমেরিকায় তৈরি ক্যামেরায় তারা তার ছবিও তুলে নিত! আর আরো চড়া দামে পৃথিবীর বাজারে তা বিক্রি করতো।

বুধবারিদের ছবি তুললো বটে, কিন্তু অরবিন্দদের ছবি তো তুলতে পারলে না জুডি হবসন।

কারণ বুধবারিদের মত অরবিন্দরা অত পেট-আলগা নয়। অরবিন্দরা যখন চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় তখন তাদের ধোপ-দুরস্ত সার্ট, পালিশ-করা জুতো, আর সদ্য কামানো দাড়ি দেখে তাদের হাঁড়ির খবর রাখবার কথা কারো মনে আসে না। বেণুদিরা যখন ভবানীপুরের ফ্ল্যাট-বাড়িতে ফার্নিচার সাজিয়ে সংসার করে আর টিকে দিয়ে বেড়ায় পাড়ায়-পাড়ায়, তখন কেউ সন্দেহ করে না যে, সেই ফার্নিচার সাজানো ফ্ল্যাট-বাড়ির ভেতরেই আবার অন্ধকারের ষড়যন্ত্র কত কুটিল হয়ে ওঠে। কিংবা সুসীরা যখন স্টুডেন্ট সেজে সমীরদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখে কিংবা স্ট্র্যাণ্ড হোটেলের ভেতরে পাম্-গ্রোভের পাশে বসে কফি খায়, তখন জুডি হবসনরা বুঝতেও পারে না, ঘন্টা পিছু কত করে রেট এ-মেয়েদের। জানতে পারে না কারা এদের সাপ্লাই করে। জানতে

পারে না কাদের কাছে এদের চাহিদা।

যেদিন জ্বডি হবসন আর ক্লারা ইণ্ডিয়া দেখতে এই হোটেলে এসে উঠলো সেদিন স্বসী এখানেই এসেছিল এই হোটেলের পাম্-গ্রোভে।

—সিনেমাটা কেমন লাগলো?

গভর্নমেন্ট গেজেটেড অফিসারের ছেলে সমীর এই লাইনে আন্কোরা। বাজারে নতুন বেরিয়েছে। বেণ্বদি আগে অনেককে দিয়েছে তার সঙ্গে। আগেকার মেয়েরা সিনেমা থেকে বেরিয়েই নিউ-মার্কেটে যেতে চেয়েছে। সেখানে গিয়ে যা হাতের কাছে পায় তাই কিনেছে। এ সে-জাতের নয়।

সিনেমা থেকে বেরিয়েই সমীর জিজ্ঞেস করেছিল—এখান থেকে কোথায় যাবে?

অন্য মেয়েরা হলে জবাব দিত—চলো নিউ-মার্কেটে যাই—

স্বসী বলেছিল—যেখানে নিয়ে যাবে।

—হাতে তোমার খাতা কীসের?

—কলেজের খাতা!

—সত্যি সত্যিই কলেজে পড়ো, না লোক-দেখানো?

স্বসী বলেছিল—তুমি দেখছি এর পরে আমার হাঁড়ির খবরও জিজ্ঞেস করবে!

সমীর বলেছিল—সত্যি বলো না, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

স্বসী বলেছিল—বেণ্বদির কাছে খবর দিলেই আমি খবর পাবো।

—তুমি ব্বঝি তোমার ঠিকানা বলবে না?

—বলা নিয়ম নেই।

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোমায় যেন কোথায় দেখেছি!

—তা দেখতে পারো। যে আমাদের টাকা দেয় তার সঙ্গেই আমরা বেরোই, তার সঙ্গেই আমরা সিনেমায় যাই। আমরা তো স্বখের পায়রা।

—এখন যাবে কোথায় তাই বলো।

—বলছি তো যেখানে নিয়ে যাবে।

—কতক্ষণ থাকতে পারবে?

—বেণ্বদি তোমাকে বলেনি কিছ্ব?

—কই, কিছ্ব মনে পড়ছে না তো? কী সম্বন্ধে?

—আমার রেট সম্বন্ধে? সন্ধ্যে ছ'টার পর আমার রেট ঘন্টায় দশ টাকা! আর রাত দশটার পর আমি কারো নয়।

—বড় বেশি রেট করেছ তো?

—তা সব জিনিসের দাম বেড়েছে, আর আমাদের রেট বাড়বে না? এতে যদি রাজী থাকো তো বলো. যেখানে খ্বশী তোমার চলো—

তা সেই স্বত্রেই স্বসীকে নিয়ে সমীর চলে এসেছিল এইখানে। এই স্ট্র্যাণ্ড হোটেলের পাম্-গ্রোভে।

ওদিকে জ্বডি হবসনও বউ নিয়ে তখন সবে সেখানে এসে বসেছে।

সমীর বললে—ওরা ট্বরিস্ট. ইণ্ডিয়া দেখতে এসেছে—

স্বসী বললে—ওরা তোমার মতই বড়লোক!

—আমি বড়লোক, তা তোমাকে কে বললে?

—বড়লোক না হলে তুমি আমার পেছনে এত টাকা খরচ করেছো কী করে? এখানে কী সবাই আসতে পারে? তুমি নিয়ে এসেছ বলেই তো আমি আসতে পেরেছি। নইলে কি এখানে এসে কফি খাওয়ার মত পয়সা আছে আমার?

সমীর একটা সিগারেট ধরালে। বললে—সিগ্রেট খাবে?

—সিগ্রেট খেলে আরো পাঁচ টাকা বেশি দিতে হবে কিন্তু!

—তা না হয় দেব! কিন্তু সব কথাতে তোমার এত টাকা-টাকা কেন বলো তো?

সুসী বললে—আমি টাকা-টাকা করলেই দোষ, আর সারা পৃথিবীর লোক যে টাকা-টাকা করছে! তার বেলায়? আমি কি পৃথিবীর বাইরে?

—ওই দেখ, ওই মেমসাহেবটা কেমন সিগ্রেট খাচ্ছে! ও তো সিগ্রেট খাওয়ার জন্যে টাকা-টাকা করছে না?

সুসী বললে—ও তো ওই সাহেবটার বউ!

—তা না-হয় তুমিও এখানে দু'ঘন্টার জন্যে আমার বউ-ই সাজলে!

—দায় পড়েছে আমার। বিয়ে করলে তোমার মত লোককে বিয়ে করবো কেন? তোমরা তো কেবল মেয়েমানুষের পেছনে টাকা ওড়াও। যারা লম্পট তাদের বিয়ে করতে যাবো কোন্ দুঃখে!

সমীর বললে—আমি যদি লম্পট হই তো তুমি কী? সতী?

সুসী বললে—খবরদার বলছি চেঁচামেচি কোর না—

কিন্তু ঝগড়াটা আর বেশি গড়ালো না। হঠাৎ দূর থেকে শিরীষবাবুকে আসতে দেখা গেল। দেখেই চিনতে পেরেছে সুসী! একদিন মাত্র দেখেছে ভদ্রলোককে। গলিটার সামনে তাঁর বিরাট গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। আর ভদ্রলোক তখন আট নম্বর বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন।

দাদার বন্ধু। দাদাই তাড়াতাড়ি আলাপ করিয়ে দিতে এসেছিল—এই আমার সিসটার, আসুন শিরীষবাবু, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই আমার সিসটারের—

মনে আছে, শিরীষবাবুর মুখ দিয়ে যেন লালা গড়িয়ে পড়ছিল। লাল পানের লালা।

শিরীষবাবু হাত-জোড় করে নমস্কার করে এগিয়ে এসেছিল।

—ও, আপনার নামই তো সুসীমা দেবী! আপনার কথা অনেক শুনেছি অরবিন্দবাবুর মুখে!

সুসী একটা শুকনো নমস্কার করে ঠোঁটে হাসি ফোটাবার ভদ্রতা করেছিল।

—কলেজ থেকে আসছেন বুঝি?

মাঝখান থেকে অরবিন্দ বলেছিল—জানেন শিরীষবাবু, আজকাল কলেজের মাস্টারগুলো কিন্তু পড়ায় না, শুধু বসে বসে মাইনে খায়—কেবল ফাঁকি—শুধু নোট-বই লেখে!

শিরীষবাবু বলেছিল—অনেস্ট লোক যে সব শেষ হয়ে গেছে দুনিয়া থেকে অরবিন্দবাবু, আমরা কয়েকজন চলে গেলে পৃথিবীটা একেবারে মরুভূমি হয়ে যাবে—

হয়ত আরো অনেকক্ষণ কথা বলবার ইচ্ছে ছিল।

অরবিন্দ বলেছিল—একটু বেড়িয়ে আসবি নাকি রে সুসী, শিরীষবাবুর গাড়ি রয়েছে, চল না আমিও যেতে পারি সঙ্গে—

শিরীষবাবু কথাটা লুফে নিয়ে বলেছিলেন—চলুন না, আমার গাড়িই আছে, চড়বার লোকের অভাব—

অরবিন্দ টপ করে বলেছিল—চড়বার লোকই যদি না থাকে তো তিনখানা গাড়ি কেন কিনতে গেলেন মিছিমিছি?

—ওই বলে কে? আর এত টাকা নিয়েই বা আমি কী করবো তাই বা কে জানে!

সাত নম্বরের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল।

অরবিন্দ আবার বলেছিল—কী রে, সুসী, যাবি?

—চলুন না। শিরীষবাবুর মুখ দিয়ে আরো লালা গড়াতে লাগলো।

সুসী বলেছিল—মাফ করবেন, আমি এখন খুব টায়ার্ড—

বলে হঠাৎ বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, আর বেরোয়নি।

তারপর কতদিন শিরীষবাবু তাদের বাড়িতে এসেছে, কত হাঁড়ি হাঁড়ি রাবড়ি এনে মা'কে দিয়েছে। মা কতবার বলেছে—খোকা তোর এই বন্ধুটা খুব ভালো তো। এর রাবড়িটা খুব মিষ্টি!

দাদা বলতো—মিষ্টি হলে কী হবে মা, তোমরা তো কেউ খাতির করো না ও'কে।

মা রেগে উঠতো।—কেন? খাতির করিনে মানে? বৌমা চা করে দেয় না?

—বৌমা চা করে দিলেই বা!

—তা আমি কী করে খাতির করি বল তো? আমার কি পোড়া চোখ আছে? আমাকে তো একটা চশমাও করে দিলিনে তুই?

অরবিন্দ রেগে যেত। বলতো—তুমি বুড়ো মানুষ, চোখে দেখতে পাও না, তোমাকে কি আমি খাতির করতে বলেছি যে বড় বলছো? কিন্তু তোমার ধাড়ি মেয়ে তো বাড়িতে রয়েছে, সে তো হাতে করে চা'টা পানটা দিয়ে আসতে পারে। তাতেও খুশী হয়ে যায় মানুষটা!

—তা বৌমা তো দেয়। সুসী হোক বৌমা হোক, যে কেউ একজন দিলেই তো হলো।

অরবিন্দ রেগে যেত। বলতো—ওই তোমার এক কথা, কেবল বৌমা বৌমা আর বৌমা। বৌমার বুকের অসুখ তা জানো? ওই বুকের অসুখ নিয়ে এত ধকল সহ্য হয়? কেন, তোমার অত বড় ধাড়ি মেয়ে একটা কাজ করতে পারে না? সে কি এ-বাড়ির কেউ নয়? বৌমা একলাই খেটে খেটে মরবে?

আশ্চর্য, সেই শিরীষবাবুকেই এই হোটেলের ভেতরে দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল সুসী। মনে হলো শিরীষবাবু যেন একলা নয়। সঙ্গে যেন আর কেউ রয়েছে। আর একজন মেয়েমানুষ। কিন্তু ভদ্রলোক তো বলেছিল তার বউ নেই।

সমীরের ওঠবার ইচ্ছে ছিল না। সুসী বললে—চলো, উঠি—

সমীর বললে—কেন, এত তাড়াতাড়ি কীসের? আমি তো ঘন্টা পিছু দশ

টাকা দেব বলেছি—

—না, আমি এখন উঠবো, বাড়ি যাবো!

কথা শেষ হবার আগেই শিরীষবাবু এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়ালেন—এই যে সুসীমা দেবী। কেমন আছেন?

যেন আচমকা বেত মেরেছে কেউ সুসীকে এমনিভাবে সে পেছনে ফিরলো। বললে—কাকে বলছেন আপনি?

—আপনার নামই তো সুসীমা দেবী?

—কী বলছেন আপনি? কে সুসীমা দেবী?

—আপনার নাম সুসীমা দেবী নয়? আপনারই ডাকনাম তো সুসী?

সুসী অবাক হবার ভাণ করলে। বললে—আপনি কাকে কী বলছেন? কে আপনি?

শিরীষবাবুও সত্যি সত্যিই আকাশ থেকে পড়েছে। বললে—সে কী? আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমার নাম শিরীষ দাশগুপ্ত। আপনার দাদার নামই তো অরবিন্দবাবু? সেই আপনাদের হারান নস্কর লেনে আট নম্বর বাড়িতে আমি গিয়েছিলুম!

সুসী বললে—আমার মনে পড়ছে না, আপনি ভুল করছেন!

—এ কি, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন! আপনার বুড়ো মা আছেন বাড়িতে, আমি রাবড়ি নিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম!

—খবরদার বলছি বাজে কথা বলবেন না। মদ খেয়ে মাতলামি করবার আর জায়গা পাননি? চলো, সমীরদা, চলো—

—কী?

শিরীষবাবুর বোধহয় অপমানে তখন নেশা ছুটে গেছে। জীবনে টাকার জোরে অনেক অপকীর্তির নায়ক হয়েছেন তিনি, কিন্তু এমনভাবে প্রকাশ্য স্থানে অপমানের মুখোমুখি হবার দুর্ভাগ্য বোধহয় তাঁর এই প্রথম!

—আচ্ছা, আমিও দেখে নেব! অনেক রাবড়ি খরচ করেছি তোমার মায়ের পেছনে, অনেক পায়ের ধুলো নিয়েছি...

জুডি আর ক্লারা একটু দূরেই দুটো চেয়ারে বসে সফট্-ড্রিঙ্ক খাচ্ছিল। পাশের গ্রোভের তলায় এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে বিলিতি জ্যাজ মিউজিক বাজছে। হঠাৎ ঝগড়ার শব্দে টুরিস্টদের তাল কেটে গেল।

—ওখানে কী হলো দেখো জুডি। লুক! লুক!

ক্লারা দেখছিল। জুডিও মুখ ফিরিয়ে দেখলে। ওরা নেটিভ। আমার আনকেল বলতো আগে নেটিভদের এই হোটেলে ঢুকতে দেওয়া হতো না এই জন্যে। দে অলওয়েজ ফাইট উইথ ওয়ান-অ্যানাদার। কুকুরের মত কেবল ঝগড়া করবে।

জুডি বললে—দে আর লাইক দ্যাট—

ক্লারা বললে—কিন্তু হোয়াই ডু দে কোয়ারল? ওরা ঝগড়া করছে কেন?

জুডি বললে—আমার আনকেল বলতো, বেঙ্গলীরা কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। কারো কিছু ভালো হলে ওরা জ্বলে-পুড়ে মরে—। ইন্ডিয়ার মধ্যে সব চেয়ে কোয়ারলিং রেস—

—স্ট্রেঞ্জ!

জুডি বললে—এই বেঙ্গলে স্ট্রেঞ্জ বলে কিছু নেই। এনিথিং মে হ্যাপেন এনি টাইম—।

তারপরে বললে—আজ বিকেলে দেখলে না গভর্নরস-হাউসের সামনে রাস্তার দিকে মুখ করে একটা কামান পড়ে আছে? ওটা চাইনিজ কামান। ওই কামান দিয়েই এতদিন আমরা এই বাঙালীদের শায়েস্তা করে এসেছি। এখন আবার ঠিক তেমনি করে ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টও ওই কামান দিয়ে এদের শায়েস্তা করে রেখেছে—

—কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চলে যেতে গেল কেন জুডি? হোয়াই?

জুডি বললে—এই বেঙ্গলীদের জন্যে। এরা কারো অথরিটি মানবে না। আমাদের অথরিটিও মানেনি, নিজেদের গভর্নমেন্টের অথরিটিও মানছে না। আমার আনকেল আমাকে সব বলেছে—

—স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

কিন্তু ওদিকে তখন পাম-গ্রোভের তলায় তুমুল কাণ্ড বেধে গেছে। সুসী যত চেঁচায়, শিরীষবাবুও তত চেঁচায়। চারদিক থেকে দৌড়ে এল হোটেলের ম্যানেজার, কেয়ার-টেকার বয়, খানসামা, চাকর, সবাই।

শিরীষবাবু হোটেলের পুরোন খদ্দের। তাকে সবাই চিনতে পেরেছে। হোয়াটস্ আপ স্যার? কী হয়েছে স্যার? দিস লেডী? হু ইজ সি? এ কে? হু আর ইউ?

সুসীর চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে।

বললে—চলো সমীরদা, আমরা চলে যাই, এই জন্যেই তো আমি কারো সঙ্গে হোটেলে আসি না।

সমীর বাইরে বেরিয়ে বললে—কিন্তু ও-লোকটা কি তোমায় চেনে?

—ও কাকে ভুল করে কাকে ধরে টানাটানি করছে!

—কিন্তু ও তো তোমার বাড়ির ঠিকানা বলছে, তোমার দাদার নাম বলছে, তোমার বৌদির নাম বলছে, তোমার নাম বলছে!

সুসী বললে—দাও, আমার টাকা দিয়ে দাও, আমি চলে যাই.—

—কত টাকা হয়েছে?

সুসী বললে—সিনেমা দেখেছি, তার দশ টাকা, আর এই চার ঘন্টার চল্লিশ টাকা। যত ছোটলোকের আড্ডা এখানে, আর কখখনো এখানে আসবো না। বাজারের মেয়েমানুষ নিয়ে এখানে ফুর্তি করতে এসেছে আর ভদ্রলোকদের মেয়েদের নিয়ে টানাটানি—দাও—

টাকাটা গুণে নিয়ে সুসী টপ করে বাসে উঠে পড়লো।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

আস্তে আস্তে লোক জমতে জমতে প্রোসেসানটা ততক্ষণে অনেক লম্বা হয়ে

গেছে। মাঝখানের লাইনে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ গড্ডলিকায় এগিয়ে চলেছে। সকালটা আজ মন্দ কাটছে না। নইলে রোজই সেই টাকার চিন্তা আর ভাল লাগে না। সকাল থেকে সুরু করে কেবল সারাদিন টাকা আর টাকা।

আর জিনিসপত্রের দামও যেন বাড়ছে হাউই-এর মত হু-হু করে। কিন্তু হাউই-এর মত হু-হু করে তো পড়বার নাম নেই। ডাক্তার বলেছিল গোপাকে একটু করে মাংস খাওয়াতে। মাংসের দোকানে সার সার পাঁঠা সাজানো থাকে। হাঁ করে রাস্তার দিকে চেয়ে দোকানদার খদ্দের ধরবারও চেষ্টা করে। অথচ দেখতে-না-দেখতে সে মাংস ফুরিয়েও তো যায়।

সেদিন ঝগড়াই করে ফেলেছিল অরবিন্দ বাজারে গিয়ে।

গাঁয়ের লোক। গাঁ থেকে মুলোটা বেগুনটা নিয়ে বাজারে আসে।

বলেছিল—কোত্থেকে দেব বাবু, দেশ-গাঁয়ে এক পালি চাল আড়াই টাকা। আমরা এক বেলা কচুর শাক সেদ্ধ করে খেয়ে বেঁচে আছি—তা জানেন?

অরবিন্দ বলেছিল—আর আমাদেরই বুঝি টাকা সস্তা?

সত্যিই, টাকা যে কত কায়দা করে উপায় করতে হয় তা অরবিন্দই জানে। শিরীষবাবুদের আর ভাবনা কী। এদিকে হারান নস্কর লেনেও আসছে আবার খদ্দর পরে রাজভবনেও যাচ্ছে। সেই রাজভবন! রাজভবনের ভেতরে কখনও যায়নি অরবিন্দ। কিন্তু বাইরে থেকে দেখেছে একটা বিরাট কামান সামনে সাজানো আছে। দিলীপদা'র টেলিফোনের বিল দিতে যেতে হয়েছিল ওই পাড়ায়।

লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেতরে চেয়ে দেখছিল অরবিন্দ।

হঠাৎ একটা গাড়ির ভেতরে দেখলে শিরীষবাবু বসে আছে।

—শিরীষবাবু, শিরীষবাবু!

সেই গাড়িটা। যে গাড়িটা চড়ে শিরীষবাবু এসেছিল অরবিন্দর বাড়িতে!

—শিরীষবাবু, এই যে, আমি অরবিন্দ। কোথায় যাচ্ছেন? ও শিরীষবাবু—

কিন্তু আশ্চর্য। গাড়িটা বোধ হয় একটু থেমেছিল ডাক শুনে। শিরীষবাবু একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেও ছিল, কিন্তু যেন চিনতে পারলে না। শিরীষবাবু এক পলক অরবিন্দকে দেখেও চোখ ফিরিয়ে নিলে। যেন কে-না কে কাকে ডাকছে। পাশেই ছিল ভূধরবাবু।

ভূধরবাবু বললেন—কে যেন ডাকলে না আপনাকে রাস্তা থেকে?

—কে? কই?

শশব্যস্ত হয়ে শিরীষবাবু এদিক-ওদিক তাকালেন। বললেন—এই দেখুন, পাবলিক ওয়ার্ক করতে করতে কত লোকের সংস্পর্শে যে আসতে হয়, সকলকে সব সময়ে চিনতেও পারিনে।

গাড়িটা তখন রাজভবনের চেক-পোস্ট পেরিয়ে অনেকখানি ভেতরে গড়িয়ে গেছে।

শিরীষবাবু জিজ্ঞেস করলেন—আপনি চীফ-মিনিস্টারকে সব বুঝিয়ে বলে রেখেছেন তো?

ভূধরবাবু গভর্নমেন্ট-মহলের নামজাদা লোক। সর্বঘটে আছেন তিনি। কোথায় কোন্ মহলে কাকে ধরলে কার কী কাজ হবে তা তাঁর নখদর্পণে। এ

সব ব্যাপারে তিনি বোধহয় ম্যাজিক জানেন। এগজিবিসন হবে ময়দানে, সেখানে কারো স্টল নেওয়া দরকার, ভূধরবাবুকে ধরো, তিনি সস্তায় সব ম্যানেজ করে দেবেন। বাড়ি করতে পারছেন না টাকার অভাবে, গভর্নমেন্ট থেকে লোন নেওয়া দরকার। এমনিতে দরখাস্ত করলে সে দরখাস্ত ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে চলে যাবে। কিন্তু ধরুন ভূধরবাবুকে। তিনি এক মিনিটে সব আদায় করে দেবেন। যাকে বলে ক্ষমতাবান লোক। ভূধরবাবু তাই।

কিন্তু শিরীষবাবুর কথা আলাদা। শিরীষবাবুকে উপকার করা মানে নিজেরই উপকার।

—জমির কথা আগে থেকে বলে রেখেছেন তো ভূধরবাবু?

ভূধরবাবু বললেন—আপনি পাবেন শিরীষবাবু, আপনি জমি পাবেন। চীফ-মিনিস্টার যাই বলুন, আপনি জমি পেলেই তো হলো?

যে কথা শিরীষবাবু হামেশা সবাইকেই বলেন, সেই একই কথা ভূধরবাবুকে বললেন। বললেন—আমি তো আর নিজের খাওয়া-পরার জন্যে করছি না এ-সব ভূধরবাবু, আমার বউও নেই ছেলেও নেই যে তাদের জন্যে জমাবো। তাছাড়া টাকা-কড়ি হলে লোকের কত রকম বদ খেয়াল থাকে। আমার তো সে-সব বালাই নেই। জীবনে কখনও মেয়েমানুষের মুখদর্শনও করলাম না, নেশা-ভাঙ করতেও শিখিনি যে তাতে টাকা ওড়াবো। ছোটবেলায় দেশের কাজে মদের দোকানে পিকেটিং করে জেলে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে বেরিয়ে এসেই ভাবলাম, চাকরি আর করবো না, করলে ব্যবসাই করবো। স্যার পি সি রায়, আমাদের সেই শিক্ষাই যে দিয়ে গেছেন। তা...

ভূধরবাবু বললেন—এ সব কথা চীফ-মিনিস্টারের কানে আমি অলরেডি তুলে দিয়েছি—

—আমি মদের দোকানে পিকেটিং করে জেলে গিয়েছিলাম সেটাও বলেছেন তো?

—আপনাকে বললাম তো যে জমি আপনি পাবেন! আপনার ফ্যাক্টরি হবে এটা তো আর আপনার নিজের কাজে নয় মশাই। দেশের কাজ! দেশে নতুন ইনডাসট্রি হলে তো গভর্মেন্টেরই লাভ মশাই। গভর্মেন্টই তো বলছে প্রোডাকশান বাড়াতে!

শিরীষবাবুর তবু ভয় গেল না। বললেন—কিছু দিতে-টিতে হবে নাকি?

চমকে উঠলেন ভূধরবাবু। বললেন—কাকে? চীফ-মিনিস্টারকে? আপনি কি পাগল হয়েছেন?

—না না, তা বলছি না, আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি। চীফ-মিনিস্টারকে ঘুষ দেবার কথা কখনও আমি ভাবতে পারি?

ভূধরবাবু বললেন—সে যখন ডিপার্টমেন্টে যাবে তখন দিতে হবে। কত দিতে হবে, সে আমি সময়মত বলে দেব।

শিরীষবাবু বললেন—সে-জন্যে আমার কিছু ক্যাশ কিন্তু আলাদা করা আছে!

—সেটা আলাদা করেই রেখে দেবেন, যেন হঠাৎ দরকার হলে দিতে দেরি না হয়।

—আসলে আমার ভয় হচ্ছে কেন জানেন? রেসিডেন্সিয়াল-কোয়ার্টারের জন্যে

গভর্মেন্ট প্লট করছে। সেখানে ফ্যাক্টরি করবো এটা যেন ডিপার্টমেন্ট চেপে যায়!

—নিশ্চয়ই চাপবে! আর এখনও স্কীমটা বাইরে আউট হয়নি, এখন তো কারো জানবার কথা নয়। খবরের কাগজে যখন বিজ্ঞাপনটা বেরোবে তার আগেই যাতে প্লটটা অ্যালট করা হয়ে যায়, সেইজন্যেই এত তোড়জোড়, নইলে আর কী!

গাড়িটা একেবারে রাজভবনের পোর্টিকোর তলায় পৌঁছোতেই ভূধরবাবু নামলেন। বললেন—আসুন, এখানে গাড়িটা থাক, ওদিক দিয়ে ঘুরে যেতে হবে, চিফ-মিনিস্টার ওই দিকের বাড়িতে থাকেন—

অরবিন্দ হাঁ করে সেই গেটটার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িটা অদৃশ্য হতেই সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে। গেটের ভেতরে চেক-পোস্টের সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। তারা অরবিন্দর দিকে কেমন সন্দেহজনক দৃষ্টি দিয়ে চাইতে লাগলো।

তারপর তার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে—এখানে কী চান মশাই? কী দেখছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? এখানে কীসের দরকার, হ্যাঁ?

অরবিন্দ তাড়াতাড়ি আর কিছু না বলে পাশে সরে এল। বিরাট কামানটা সাজানো রয়েছে রাস্তার দিকে মুখ করে। অরবিন্দর মনে হলো কামানটা যেন এক চোখ দিয়ে তার দিকে দেখছে। এক চোখ দিয়ে তার দিকে গুলি তাগ করছে।

ওটা কেন রেখেছে ওখানে কে জানে? ভয় দেখাচ্ছে? কাকে ভয় দেখাচ্ছে? গরীবদের? না চোর-ডাকাতদের?

যার দিকেই তাগ করুক, যাকেই ভয় দেখাক, অরবিন্দর ওখানে যাওয়ার দরকার কী? শেষকালে তাকেই হয়ত গুলি খেয়ে মরতে হবে। অরবিন্দ মরে গেলে কেউ প্রতিবাদও করবে না। কেউ প্রতিকারও করবে না। তার কেউ নেই সংসারে। বরং তার ওপরে নির্ভর করে একটা সংসার কোনও রকমে খেয়ে পরে বেঁচে আছে। তখন তাও থাকবে না। তখন মাকে রোজ রোজ রাবড়ি যোগাবে কে? তখন দুটো বাড়ির ভাড়াই বা কোত্থেকে জুটবে? তখন গোপাই বা কী করে পেট চালাবে? যা শরীর! একটু মোটা হলে তবু কথা ছিল। মোটা হলে শিরীষবাবুর হয়ত তবু পছন্দ হতো!

সেখান থেকে যাদবপুরে ফিরে গিয়েই দিলীপদা'কে সেই কথাই বললে অরবিন্দ।

'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভান্ডারে'র মালিকের কাছে এ-সব কথা নতুন নয়। বললে—তা তোকে পাঠালুম টেলিফোনের বিল জমা দিতে, তুই আবার রাজভবনের সামনে গেলি কেন?

অরবিন্দ বললে—ভাবলাম এত দূরে এসেছি একটু ডালহৌসী-স্কোয়ারটা দেখে যাই।

—কত ট্রাম ভাড়া লাগলো?

অরবিন্দ বললে—ট্রাম ভাড়াটা আমি বাঁচিয়েছি দিলীপদা—

—কী করে বাঁচালি?

—ভাড়া দিলুম না।

—সে কী রে? তোকে ভাড়া না নিয়ে চড়তে দিলে?

অরবিন্দ বললে—না, তা নয়, যেই ভাড়া চাইতে এল কনডাকটার আর অমনি নেমে পড়লুম। নেমে পেছনের ট্রামে উঠলুম। এমনি করে কেবল উঠেছি আর নেমেছি—

—তা বেশ করেছিস। বিলটা দে।

অরবিন্দ বিলটা দিয়ে দিলে। বললে—কিন্তু তোমার বন্ধু শিরীষবাবুর কাণ্ডটা কেমন দেখলে তো? আমাকে মোটে চিনতেই পারলে না। অথচ আমাদের বাড়িতে যখন আসেন তখন আমি নিজের হাতে চা করে দিই, তা জানো?

—সে সব তো শুনেছি। কিন্তু কথা ছিল তোর বোনের সঙ্গে তুই আলাপ করিয়ে দিবি, তার বেলায়!

অরবিন্দ বললে—কী করবো দিলীপদা, তুমি তো সুসীকে জানো। কী রকম জাঁহাবাজ মেয়ে সে তো তোমার জানতে বাকি নেই। কিছুতেই রাজী হয় না। আমি কত করে বললাম যে মস্ত বড়লোক, তুই একটু ওর গাড়িতে চড়ে লেকের দিকে বেড়িয়ে আয়, তা কিছুতেই শুনলে না—

—অথচ বারো টাকা দিয়ে এক কিলো রাবড়ি কিনে দিলে তোর মা'কে শিরীষবাবু—

—সত্যি খুব ভাল রাবড়িটা দাদা! খুব সব ছিল ভেতরে।

—দূর হতভাগা, দিলে তোর মা'কে আর তুই খেলি?

অরবিন্দ বললে—মা যে দিলে! আমি কি একলা খেয়েছি? আমি খেয়েছি, গোপা খেয়েছে, সুসী খেয়েছে।

—শিরিষবাবুর রাবড়ি খেতে তো তোর বোনের বাধলো না! যাই বলিস, তোর বোনটা সুবিধের নয় তেমন।

অরবিন্দ বললে—সে তো হাজার বার! সে আর বলতে! যদি একটু বিবেচক হতো দিলীপদা তো আজকে আমার ভাবনা! অত বড় ধাড়ি বোন থাকতে আমার এই অভাব ভাবতে পারো? তুই তো দেখতে পাচ্ছিস দাদার হাল, দেখতে পাচ্ছিস তোর বৌদির স্বাস্থ্য, দেখতে পাচ্ছিস টাকার জন্যে মা'র একটা চশমা পর্যন্ত করতে পারছি না। সবই তো দেখতে পাচ্ছিস, তবু তোর সংসারের জন্যে একটু দয়া হয় না রে!

দিলীপ বললে—আজ আমি একটা কথা তোকে বলে রাখছি অরবিন্দ, তুই তোর বোনের জন্যে অত করছিস তো, একদিন কিন্তু তোর বোন তোকে কলা দেখিয়ে দেবে, তা বলে রাখছি—

অরবিন্দ বললে—তা আমি জানি দিলীপদা, আমার কপালে অনেক দুঃখু আছে!

—তোর বোন লুকিয়ে লুকিয়ে হোটেলে গিয়ে লোক বসায়, তা জানিস?

—না না, কী যে বলো তুমি দিলীপদা, সুসী অত খারাপ নয়।

—খারাপ নয় মানে? তুই প্রমাণ চাস?

অরবিন্দ বললে—না না, ওই সিল্কের শাড়ি পরে বলে বলছো তো?

দিলীপদা বললে—না. তা নয়, শিরীষবাবু নিজে সাক্ষী আছে। তোর বোনকে বাইরের লোকের সঙ্গে হুইস্কি খেতে দেখেছে!

—ছিঃ, কী যে তুমি বলো দিলীপদা। সুসীর অত সাহস হবে না।

—বেশ, তাহলে শিরীষবাবুর সঙ্গে মুকাবিলা করে দেব তোর। তুই শিরীষবাবুর মুখ থেকেই শুনিস। শিরীষবাবু তো আর মিথ্যে কথা বলবে না!

অরবিন্দ যেন আকাশ থেকে পড়লো। খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোল না তার। সুসীকে যে সে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। সেই সুসী লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খাবে এ-কথা কল্পনা করতেও যেন অরবিন্দর কষ্ট হলো। খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল দিলীপদা'র মুখের দিকে।

—তুমি সত্যি বলছো দিলীপদা?

দিলীপদা হেসে উঠলো হো হো করে। বললে—তোর বোন একলা মদ খাচ্ছে নাকি? তুই অত অবাক হচ্ছিস কেন? সবাই তো খায় রে। নইলে আজকালকার বাপ-মা'দের মেয়ের খরচ যোগানো সোজা নাকি? ক'টা বাপ-মায়ের সে-ক্ষমতা আছে শুনি?

অরবিন্দ তখনও সামলে উঠতে পারেনি।

দিলীপদা বললে—যা যা, তিনটে বাজলো, ভাত-টাত খেয়ে নিগে যা।

সারাদিন অরবিন্দ ডালহৌসী স্কোয়ারে টো-টো করে ঘুরেছে। সকাল থেকে খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয়নি। মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো তার। তারপর আর কোনও কথা না বলে সোজা একেবারে হারান নস্কর লেনের দিকে পা বাড়ালো। সুসী মদ ধরেছে...সুসী মদ ধরেছে...সুসী মদ ধরেছে...

লম্বা মিছিলটা কলকাতা লক্ষ্য করেই চলেছে। সেই তারই মাঝখানে এক মনে নিজের কথা ভাবতে ভাবতেই আজ স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়েছে অরবিন্দ। চলো, কলকাতা চলো। অনেক দূর থেকে আমরা সবাই কলকাতায় চলেছি। সেখানে গেলেই আমরা আমাদের পাওনা পেয়ে যাবো। চলো ভাই, কলকাতা চলো! ইনকাব জিন্দাবাদ।

সবাই মিলে এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো—চলো চলো কলকাতা চলো—

আর শুধু কি একলা অরবিন্দ? অনাদি কাল ধরে সবারই তো একই লক্ষ্য। সবাই কলকাতায় যায়। কলকাতাই তো বাঙালীর স্বর্গ। ভিখিরি হতে গেলেও কলকাতায় যেতে হবে, আমীর হতে গেলেও কলকাতায় যেতে হবে। লেখাপড়া শিখতে চাও? কলকাতায় চলে এসো। লেখাপড়া ভুলতে চাও, কলকাতায় চলে এসো। সাধু হতে গেলে এখানে আসতে হয়, চোর হতে গেলেও এখানেই আসতে হয়। সেই আদিকাল থেকে দলে দলে সব দেশের লোক এখানেই এসেছে। এই কলকাতায়। তাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও একদিন যেমন এসেছেন, তেমনি এসেছিলেন নন্দকুমার। এসেছে মাড়োয়ারী, গুজরাটি, পার্শি, শিখ, হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ সবাই। সেই আদিকাল থেকে কলকাতা লক্ষ্য করেই

সবার গতি, কলকাতায় এলেই সকলের মুক্তি।

জুডি হবসন জন্মেছে কোন্ এক দেশে, তারও যেন এই কলকাতায় না এসে মুক্তি ছিল না। হাজার হাজার পাউণ্ড খরচ করে এখানে ঠিক এই সময়ে তার না এলে কী এমন ক্ষতি হতো?

কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধানে যেমন বুধবারিকে সেই জয়চণ্ডীপুরের কুঁড়ে ঘরটা ছেড়ে এই কলকাতাতে আসতে হয়েছে, জুডি হবসন আর ক্লারা ডেনহ্যামকেও তাই।

রাত্রে ডিনার খেতে খেতে 'ডাইনিং হলে' চারদিকের আবহাওয়া দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল জুডি হবসন।

সকাল থেকেই হোটেলের ওয়েটারগুলো ছেঁকে ধরেছে। এক টিন সিগারেট আনতে দিলে তারা পাঁচবার সেলাম করে। অথচ আনকেল হবসন যখন এখানকার বেঙ্গল গভর্নরের মিলিটারি সেক্রেটারি ছিল তখন এদের কতলোককে গুলী করে মেরেছে। নিজের হাতে রাইফেল নিয়ে কতলোককে গুলী করেছে এই কলকাতার রাস্তায়।

—রাস্তার ওপর গুলী করেছে?

সমস্ত কলকাতাটা ছিল একটা কেল্লা। ওদিকে শ্যামবাজারের মোড় থেকে সুরু করে ওদিকে সাউথে টালিগঞ্জের শেষ পর্যন্ত সমস্ত এরিয়াতে পুলিশ লোক খুঁজে বেড়িয়েছে খুন করবার জন্যে। নেটিভ দেখলেই খুন। কিন্তু পুলিশের গাড়ি দেখলেই নেটিভরা গলি-ঘুঁজির মধ্যে ঢুকে পড়তো। তখন আর তাদের পাত্তা পাওয়া যেত না। মেশিনগান নিয়ে আমরা তাড়া করেছি নেটিভদের পেছনে-পেছনে। তারা বাড়ির ভেতর থেকে ঢিল মেরেছে। ভাঙা ইঁটের টুকরো। তাই দিয়ে আমার আর্মির সোলজাররাও কতক মরেছে, কতকের চোখ কানা হয়েছে।

ক্লারা বললে—তা তোমরা নেটিভদের ভয়েই ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে গেলে নাকি?

সে-সব পুরোন ইতিহাস। আনকেল হবসন যখন গল্প করতো তখন কথা বলতে বলতে আবেগে তার গলা বুজে আসতো। সে এখন ইতিহাসের পুরোন চ্যাপ্টার হয়ে গেছে। সে-সব দিন আর নেই।

ভাইপো জুডি সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু ইণ্ডিয়া ছেড়ে তোমরা চলে এলে কেন আনকেল?

কেন যে চলে এলুম তা জিজ্ঞেস করো তোমাদের ইংলণ্ডের প্রাইম-মিনিস্টারকে। ইতিহাসের গতি তখন বদলে গিয়েছে। আমরাই নেটিভদের একদিন ইংরিজি ভাষা শিখিয়েছি। আমাদের বই বিক্রি হবে বলে আমরা কোটি-কোটি বই ছাপিয়ে ইণ্ডিয়াতে পাঠিয়েছি। তাতে কোটি কোটি পাউণ্ড লাভও করেছি। কিন্তু সেই সব বই পড়েই নেটিভদের একদিন চোখ খুলে গেল। তারা ভাবতে শিখলে তারাও মানুষ। নেটিভদের মধ্যেও একটা-একটা করে গজিয়ে উঠতে লাগলো ম্যাটসিনি, গ্যারিবলডী, আর উইলিয়ম দ্য কনকারার।

—উইলিয়ম দি কনকারার?

জুডি হবসন সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল আনকেলের কথা শুনে। কে সে? হু ইজ হি?

আনকেল বলেছিল—সে-ই তো আমাদের আসল শত্রু রে। আমাদের ডেড্‌লিয়েস্ট এনিমি—দ্যাট্ সুভাষ বোস। দে কল্ হিম নেতাজী। আমরা নেহেরুকে ভয় করিনি, গান্ধীকে ভয় করিনি, কিন্তু সুভাষ বোসকে ভয় করেছি. নেটিভদের মধ্যে সে ছিল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার—

সেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেশেই তাই হনিমুন করতে এসেছে জুডি আর ক্লারা। তাই এখানে যা কিছু চোখে পড়ছে সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। এই-ই হচ্ছে সেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেশ। এই কলকাতা! কিন্তু কই, চেহারা দেখলে মনে হয় না এরাই সেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বংশধর। লোকগুলোর চোখ বসা, রোগা-রোগা চেহারা, কাটির মতন হাত-পা। এ-রকম মরণ-দশা কেন হলো এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বংশধরদের? এই হোটেলের ভেতরে বসে বসে তারাই কল্ গার্ল সঙ্গে করে নিয়ে এসে মদ খাচ্ছে, মাতলামি করছে, আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে?

—কেন এমন হলো জুডি?

জুডি বললে—ওই যে তোমায় বললুম, আমরা এখান থেকে চলে গিয়েছি বটে, কিন্তু একটা জিনিস রেখে গিয়েছি—

—কী? কী সেটা?

—ওই কামানটা। ওই ওয়ান-আইড ক্যাননটা। এক-চক্ষু কামানটা আমরা রেখে গিয়েছি গভর্নরস্-হাউসে। সামনে রাস্তার দিকে তাগ্ করে বসানো আছে। ওটা চাইনিজ কামান। ওর নিচেয় একটা ড্রাগন আছে। ড্রাগনের পিঠের ওপর বসানো আছে কামানটা। একদিন ওই কামান দিয়ে আমরা কত লোককে গুলী করে মেরেছি, এখন নেটিভদের গভর্মেন্ট হয়েছে, এখন এরাও গুলী করছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বংশধরদের এরাও আমাদের মত গুলী করে মারছে

—কেন, মারছে কেন?

—সেইটেই তো ভাগ্যের পরিহাস। আয়রনি অব ফেট।

ওয়েটারটা সিগারেটের টিন কিনে নিয়ে এসে লম্বা একটা সেলাম করলো।—সেলাম সরকার।

জুডি যখন একটা টাকা বখশিস দিলে, লোকটা আরো নিচু হয়ে আরো লম্বা একটা সেলাম করলে। সেলাম সরকার, সেলাম!

বয়টা খুব খুশী হয়েই চলে যাচ্ছিল।

জুডি বললে—এবার একটা মজা দেখাই তোমায় ক্লারা—

বলে ওয়েটারটাকে ডাকলে—বয়, ইধার শুনো—

ওয়েটার আবার ফিরে এসে সেলাম করলে।

জুডি বললে—বয়, পোট্যাটো কত করে কিলো কলকাতায়?

—সরকার, এক টাকা!

—তোমরা পেট ভরে খেতে পাও? আর ইউ হ্যাপি? ডু ইউ গেট এনাফ টু ইট?

হঠাৎ এই প্রশ্নে উড়িষ্যা দেশের ইউনিফর্ম পরা ওয়েটার গুণধর যেন খুশীতে বিগলিত হয়ে গেল একেবারে। কাঁদো কাঁদো গলায় ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে ওয়েটারটা নিজের দুঃখ-দুর্দশার সবিস্তার কাহিনী বলে যেতে লাগলো। কত

ছেলে-মেয়ে তার, কত টাকা মাইনে পায়, কত টাকা বাড়ি ভাড়া দেয়, সমস্ত... সমস্ত...

জুডি হবসন থামিয়ে দিলে তাকে। বললে—তোমাদের এই নেটিভ গভর্মেন্ট ভালো, না ইংরেজ সরকার ভাল ছিল?

—হুজুর, ও-জমানাতে আমরা পেট ভরে খেতে পেতাম, আপনারা আবার আসুন হুজুর, আবার ফিরে আসুন। আপনারা এলে আমরা খেয়ে-পরে বাঁচবো—

লোকটাকে যেতে বলে জুডি হবসন একটা টাটকা সিগারেট ধরালো। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বলতে লাগলো—দেখলে তো? তুমি তো নিজের কানেই শুনলে সব? দিস ইজ ইণ্ডিয়া, দিস ইজ বেঙ্গল। দিস ইজ ক্যালকাটা, এই হলো আসল কলকাতার খবর, এ-খবর এদের এখানকার খবরের কাগজে বেরোয় না, আমাদের এম্পায়ার গেছে বটে, কিন্তু এরা এখনও আমাদের চায়! এই ইণ্ডিয়া, আফ্রিকা, বার্মা, সিলোন, পাকিস্তান, সব জায়গার এই একই চিৎকার। দে ওয়ান্ট দ্য ব্রিটিশ টু কাম ব্যাক্—সবাই চায় আমরা আবার ফিরে আসি—

মনে আছে সেদিন অরবিন্দ অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছিল। হারান নস্কর লেন সন্ধ্যেবেলাই নিরিবিলি হয়ে যায়। ব্লাইণ্ড লেনের মধ্যে তো আরো বেশি নিরিবিলি। বুড়ী-মা অন্ধ-চোখ নিয়ে একলা দরজা আগলে বসে থাকতে পারে না। আফিমের নেশায় সন্ধ্যে থেকেই ঢোলে।

বলে—তুই শুতে যা খোকা, আমি দরজা খুলে দেব—

—তুমি দরজা খুলে দেবে মানে? তুমি কি চোখে দেখতে পাও যে দরজা খুলবে? শেষে যদি পড়ে যাও তো তখন তো সেই আমাকেই দেখতে হবে। আমারই হয়েছে যত ঝামেলা। ওষুধ-ডাক্তার করতে তো সেই আমাকেই ছুটতে হবে। না কি, তোমার আদরের মেয়ে যাবে ডাক্তার ডাকতে?

বুড়ী বলে—তুই যে কী বলিস, সে হলো মেয়েমানুষ, আর তুই বেটাছেলে, তার সঙ্গে তোর তুলনা? সে লেখাপড়া করবে না সংসার করবে?

—তা এত রাত্তির পর্যন্ত তার কীসের লেখা-পড়া শুনি? রাত্তিরেও কি তার কলেজ?

—ওমা, রাত্তির বেলা কলেজ হবে কেন? কলেজ থেকে মেয়ে-পড়াতে যায়, তা জানিস না?

—মেয়ে পড়ায়? তোমাকে সুসী তাই বলেছে বুঝি?

—মেয়ে যদি না-পড়ায় তো নিজের খরচ নিজে চালায় কী করে? তুই কি ওর শাড়ি কিনে দিস, না ওর জুতো কিনে দিস?

অরবিন্দ বললে—মেয়ে পড়িয়ে ওই সিল্কের দামী-দামী শাড়ি আসে তুমি মনে করো? ওর শাড়ি তুমি দেখছ? ওর এক-একটা শাড়ির কত দাম তুমি জানো? যদি না জানো তো তোমার বৌমাকে জিজ্ঞেস করো।

—তা নিজের টাকায় ও শাড়ি কিনছে তাতে তোর কী?

—নিজের টাকায় শাড়ি কিনছে বেশ করছে, কিন্তু সংসারে কিছু দিলে তো আমার সাশ্রয় হয়। আমি কোত্থেকে কেমন করে সংসার চালাচ্ছি তা তো আর তুমি টের পাচ্ছো না, তাই বলছো। তোমার বৌমাকে ডাক্তার মাংস খাওয়াতে বলছে, আমি মাংস খাওয়াতে পারছি? এই যে তোমার চোখ খারাপ হয়েছে, একটা চশমা করে দিতে পারছি? এই যে রান্না করতে করতে আর বাসন মাজতে মাজতে তোমার বৌমার শরীর কালি হয়ে যাচ্ছে, তা একটা রান্নার লোক রাখতে পারছি? আর, তা ছাড়া তোমাকে এত বলেই বা কী লাভ। তুমি তো আর তোমার মেয়ের কোনও দোষ দেখতে পাবে না। মেয়ে বলতে তুমি অজ্ঞান। এইটে জেনে রেখো মা, ওই মেয়েই তোমার স্বগ্যে বাতি দেবে, হ্যাঁ। তখন বুঝবে ঠ্যালা

মা কথাগুলো শুনতে লাগলো। কিছু উত্তর দিলে না। বললে- আমারই কপাল বাবা, আমার যদি চোখ থাকতো তো কাউকেই খাটতে হতো না সংসারের জন্যে, আমি নিজেই রান্না করতুম, আমি নিজেই বাসন মাজতুম। আমার যে গতর গেছে, গতর আর চোখ গিয়েই যে আমি মরেছি—

হঠাৎ মনে হলো বাইরে হারান নস্কর লেনের ব্লাইন্ড-গলিতে কার পায়ের আওয়াজ হলো।

অরবিন্দ বললে—ওই আসছেন রাজরাণী—

মা বললেন—তুই অমন করে বলিসনে খোকা, দু'দিন বাদে বিয়ে হয়ে যাবে, পরের ঘরে চলে যাবে. যে-ক'টা দিন কপালে আরাম আছে করে নিক, তারপর পরের বাড়ির বউ হলে কষ্ট তো আছেই—

কটা-কট্-কট্-কট্‌কট্—

খুব জোরে জোরে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

—দেখছ মা, এত রাত করে বাড়ি আসছে তার ওপর আবার কড়া নাড়বার তাড়া দেখ, যেন আমার দশটা চাকর আছে রাজরাণীকে দরজা খুলে দেবার জন্যে

দরজার দিকে যেতে যেতে অরবিন্দ আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলে না। চিৎকার করে বললে—দাঁড়া রে বাবা দাঁড়া, তোর দরজা খুলে দেবার জন্যে দশটা বাঁদী নেই বাড়িতে। হ্যাঁ—এই এতক্ষণে মেয়ের কলেজ বন্ধ হলো, খুব লেখা-পড়া হয়েছে, লেখা-পড়া আমরা করিনি বলে যেন ইস্কুল-কলেজের খবর রাখি না—দাঁড়া—

কিন্তু দরজা খুলতেই অরবিন্দ আকাশ থেকে পড়লো। সামনেই মোটা একটা রেগুলেশন লাঠি নিয়ে একটা পুলিশ কনস্টেবল্ দাঁড়িয়ে আছে—

অরবিন্দ পুলিশ দেখেই এক-পা পেছু হঠে এসেছে! পুলিশের সঙ্গে অরবিন্দর জীবনে কখনও মুলোকাত হয়নি আগে। পুলিশ রাস্তায় থাকে, তারা রাস্তার বাহার। কিন্তু বাড়ির মধ্যে এসেছে কেন? আমি ত মদ চোলাই করি না, আমি তো ব্ল্যাক-মার্কেট করি না, সোনার ইঁট কিনেও লুকিয়ে রাখি না! আমাকে ধরতে এসেছ কেন?

অন্ধকার ঝাপসা গলির পটভূমিকায় পুলিশটার মূর্তিটা যেন বড় ভয়ঙ্কর ঠেকলো অরবিন্দর কাছে।

পেছন থেকে অন্ধবুড়ী তখন চেঁচিয়ে বলছে—হ্যাঁলা সুসী, এত রাত্তির করিস কেন বাছা, আর এটু বেলাবেলি ফিরতে পারিস নে—

পুলিশটা বললে—ম্যয় থানাসে আয়া, বড়বাবু আপ্‌কো বোলায়া—চলিয়ে—

অরবিন্দর গলাটা তখন ভয়ে বুজে এসেছে। বললে—আমাকে? আমি কী করিচি?

—কেয়া মালুম! লেকন্ আব্‌ভি চলিয়ে—

অরবিন্দ সেইখানে দাঁড়িয়েই থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

এর সুরু সেই ১৯৪৩ সাল থেকেই। ১৯৪৩ সালেই সুরু হয়েছিল কলকাতায় আসা। তখন শিরীষবাবুরা ছিল মিলিটারি কনট্র্যাকটার। মানুষের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে সাউথ-ইস্ট-এশিয়া কম্যাণ্ডের সোলজারদের জন্যে তা জমিয়ে রাখা হয়েছিল সরকারি গুদামে। তখন থেকেই দু' মুঠো ভাতের জন্যে লোক আসতে সুরু হয়েছিল এই কলকাতায়। সে সব দৃশ্য অরবিন্দরা দেখেনি। দেখেছিল অরবিন্দর বুড়ী মা। দেখেছিল ওই বুধবারির মা, আর দেখেছিল ওই স্ট্র্যাণ্ড হোটেলের বয়-বাবুর্চি-খানসামারা। তারপর আঠারো-উনিশ বছর কেটে গেছে। এই এত বছরের মধ্যেও কলকাতায় চলা থামেনি। কোথায় মুর্শিদাবাদ, কোথায় জলপাইগুড়ি, কোথায় হুগলি, চুঁচুড়া, বর্ধমান থেকে হেঁটে হেঁটে মানুষের মিছিল এসেছে কলকাতা লক্ষ্য করে।

সবাই চিৎকার করে গলা ফাটিয়েছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

সে-চীৎকারে দিল্লীর কর্তাদের টনক নড়েনি। ইন্দ্রপ্রস্থের প্রেসিডেন্টের এয়ার-কনডিশনড্ ঘরে সে-শব্দ বার বার শুধু মাথা কুটে ব্যর্থ প্রচেষ্টায় প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে। ইন্দ্রপ্রস্থের ফাইনান্স মিনিস্টারের পোর্টফোলিওতে তারা একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি।

কিন্তু আমেরিকার 'হোয়াইট-হাউসে' বসে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের টনক নড়লো প্রথম। এত বড় একটা আণ্ডার-ডেভেলপ্‌ড্ কান্ট্রি হয়ে ইণ্ডিয়া কমিউনিস্ট ব্লকে চলে যাবে এতে ক্ষতি তো ইণ্ডিয়ার নয়—ক্ষতি হবে আমেরিকার। ব্রিটিশ গভর্মেন্ট ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে এসেছে। আর শুধু ইণ্ডিয়া নয়—আফ্রিকা, মালয়, বার্মা, সিলোন সব ফাঁকা। জায়গা ফাঁকা রাখলে কেউ-না-কেউ গিয়ে ওদের ছোঁ মারবে। ওদের বাজার কেড়ে নেবে। সুতরাং একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

সুতরাং কন্‌ফিডানশিয়াল ডেসপ্যাচ্ পাঠানো হলো সব এমব্যাসিতে। হাল-চাল জানাও। ওখানকার সাধারণ মানুষের মতিগতির খবর পাঠাও। তারা কী চায়, তারা কী ভাবে, তারা কী আলোচনা করে তার খবরদারি করো। জরুরী ব্যাপার। ইন্দ্রপ্রস্থের কর্তাদের হালচাল সম্বন্ধে স্পাইং করো।

ফিরতি ডেসপ্যাচে খবর গেল।

খবর সবই ভাল ইওর এক্সেলেন্সি। কোনও কিছু ভয় করবার নেই। এভরি-থিং ইজ অলরাইট ইন দি স্টেট অব ডেনমার্ক এ্যাণ্ড্ গড্ ইজ্ ইন্ হেভেন্। মাটির পৃথিবীতে সবই কুশল আর মাথার ওপর ভগবান। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা-

ধিরাজ নিশ্চিন্ত। ভেরি হ্যাপি সবাই। সবাই পিস চাইছে। বড় বড় ড্যাম বানাচ্ছে, আর হেভি-ইনডাসট্রি তৈরি করছে। তারা ভাবছে একদিন হেভি-ইনডাসট্রি দিয়েই তারা রেলওয়ে ইলেকট্রিফাই করবে, ঘরে ঘরে বিজলীবাতি পৌঁছিয়ে দেবে হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার দিয়ে। বান্দুং কনফারেন্সের পঞ্চশীল নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। আর ভয় নেই ওদের। সব ঠিক হো যায়েগা। বড় বড় চাকরি পাচ্ছে মিনিস্টারদের রিলেটিভরা। তাদের ছেলেরা ফরেন-এক্সচেঞ্জ খরচ করছে দু'হাতে। তারা ইংলণ্ড যাচ্ছে, আমেরিকা যাচ্ছে, ডিনার খাচ্ছে, পার্টি দিচ্ছে। আগে যারা খদ্দর পরতো এখন তারা পুরোদমে টেরিলিন টেরিকটের সুট-টাই সার্ট ধরেছে। কিন্তু...

—কিন্তু কী?

—কিন্তু স্যার, বড় মুশকিল হয়েছে ক্যালকাটা নিয়ে।

—ক্যালকাটা? সে কী? ক্যালকাটাই তো হলো ইণ্ডিয়ার ব্রেন। ইণ্ডিয়ার ব্রেন-সেন্টার। সেই মাথাতেই মুশকিল বাধলো?

এখান থেকে আবার লম্বা চওড়া ডেসপ্যাচ গেল। ইয়েস স্যার। ক্যালকাটা--ব্রিটিশ এম্পায়ারের সেই সেকেণ্ড সিটিতে এখন ঘুণ ধরেছে। এখানকার মানুষ এই স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিয়েছে একদিন, টেররিস্ট-পার্টিতে ঢুকে লাট-সাহেবদের গুলী করেছে। এখানকার মানুষই একদিন ব্রিটিশ ইম্পিরিয়্যাল সার্ভিসকে ভয়ে থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এই ক্যালকাটাতেই এখন সব চেয়ে বেশি ফ্রাশট্রেশান। এ-শহরে জল নেই, হাওয়া নেই, জমি নেই। ছেলেদের খেলবার একটা পার্ক পর্যন্ত নেই। এখানে ধোঁয়ার জন্যে মানুষের টি-বি রোগ হচ্ছে। এ-শহরের ফুটপাথ এখন মানব-শাবকের আঁতুড়-ঘর। এখানকার মেয়েরা এখন কলেজে যাবার নাম করে 'কল-গার্ল'র ব্যবসা সুরু করেছে। এখানে যারা বাড়িতে-বাড়িতে ভ্যাক্সিনেশন দিয়ে বেড়ায় তারা এখন আড়কাটি হচ্ছে। তারা মেয়েমানুষ জোগাড় করে দেবার ব্যবসা সুরু করেছে। এখানকার গৃহস্থরা এক ঠিকানায় শোয়, আর এক ঠিকানায় রান্না করতে যায়। নিজের স্ত্রীকে ভাড়া খাটিয়ে এরা সংসার চালাবার প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় বিভ্রান্ত। এখানে যারা বাড়ির বুড়ী বিধবা মা তাদের একটা চশমা কেনবার পয়সা জোটে না, কিন্তু সেই বাড়ির মেয়ের পায়ে তিরিশ টাকা জোড়া দামের চটি থাকে। এরা কী করবে তা বুঝতে না পেরে অন্য কোনও উপায় না পেয়ে প্রোসেশান করে, মিছিল করে, ময়দানের দিকে দল বেঁধে যায়, আর যখন ময়দানের মীটিং ভেঙে যায় তখন বেঙ্গলের গভর্নরের বাড়ির সামনে রাস্তায় বসে পড়ে চিৎকার করে-ইনক্লাব জিন্দাবাদ--

বলে—মজুতদারের শাস্তি চাই।
সস্তাদরে খাদ্য চাই।
আরো বলে—মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও
নইলে গদী ছেড়ে দাও--

রিপোর্ট পড়ে 'হোয়াইট-হাউসে' মীটিং বসলো। বড় কনফিডানশিয়াল মীটিং। এই-ই সুযোগ। সারা সাউথ-ইস্ট-এশিয়ায় এখন ভ্যাকুম রয়েছে। একে-বারে ফাঁকা এরিয়া। এ সুযোগ আমরা ছাড়বো না। তিনদিন ধরে মীটিং চললো।

অনেক ডেসপ্যাচ এল গেল। পরামর্শ যখন শেষ হলো তখন এক নতুন ফাইল খোলা হলো ওয়াশিংটনের হোয়াইট-হাউসে। নতুন ফাইল, নতুন দাওয়াই। এ দাওয়াই-এর নাম আগে কেউ শোনেনি! একেবারে নতুন নাম।

ঠিক হলো ক্যালকাটাতে আমরা মিল্‌ক পাউডার পাঠাবো, গম পাঠাবো, চাল পাঠাবো, ওষুধ পাঠাবো, টোব্যাকো পাঠাবো। ক্যালকাটার মানুষের যা-যা নিত্য আবশ্যক সব পাঠাবো। বই পাঠাবো। এক্সপার্ট পাঠাবো। তার জন্যে কোনও দাম দিতে হবে না ইন্ডিয়াকে। তার বদলে যে-দাম ন্যায্য পাওনা হয়, সেইসব টাকা খরচ করতে হবে ক্যালকাটার মানুষের সুখ-সুবিধের জন্যে। তারা যেন খাবার জল পায়, নিঃশ্বাস নেবার জন্যে তারা যেন ফ্রেশ এআর পায়, ভদ্রভাবে মাথা গোঁজবার জন্যে তারা যেন আশ্রয় পায়। ব্যস, তাহলেই আর তারা কম্যুনিস্ট হতে চাইবে না। সবাই গুণগান করবে আমেরিকার। বলবে—জয়, জয়, জর্জ ওয়াশিংটনের জয়, জয় আব্রাহাম লিংকনের জয়, জয় জেনারেল আইসেনহাওয়ারের জয়! বলবে—জয় ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার জয়!

সেই দাওয়াই-এর নামই হলো—পাবলিক ল'জ-ফোর এইট্টি। এক কথায় পি এল ৪৮০।

এ হলো ১০ই জুলাই ১৯৫৪ সালের কাহিনী।

—তারপর?

এখান থেকে লোক চলে গেছে আমেরিকায়। আমেরিকা থেকে লোক চলে এসেছে। কলকাতাকে বাঁচাতেই হবে। এখানকার মানুষের খাবার জন্যে জল দিতে হবে, বাঁচবার জন্যে হাওয়া দিতে হবে। নইলে কলকাতার ফুটপাতের আঁতুড়ঘরে নতুন জাতক শিশু-ইন্ডিয়ার অপঘাত-মৃত্যু হবে।

আর এক-একদিকে এখান থেকে লোক চলে গেছে চেঙ্গাইল, বাউড়িয়া, উলুবেড়িয়া। হুগলী, বর্ধমান, চুঁচুড়ায়। শিবপুর, বজবজ, হাওড়ায়! আজ জুটমিলের কাজ ছেড়ে চলো ভাই কলকাতায় যাই। কলকাতার ময়দানে মীটিং আছে আমাদের। আমরা আমাদের দাবী জানাবো গভর্মেন্টের কাছে। আমরা সরকারকে বলবো যে-মাইনে আমরা পাচ্ছি, সে মাইনে আমাদের বাড়াতে হবে। ডিআরনেস্ এ্যালাউনস্ ইন্‌ক্রিজ্ করতে হবে। আমাদের সস্তা দরে চাল দিতে হবে, গম দিতে হবে। বাঁচার মত বাঁচতে দিতে হবে। চলো ভাই, কলকাতা চলো...

পিল-পিল করে লোক আসতে সুরু করলো কলকাতায়। ওদিকে শেয়ালদা, বসিরহাট, বারাসত, নারকেলডাঙ্গা, এদিকে হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, হাওড়া, আর দক্ষিণে যাদবপুর, ক্যানিং, সুন্দরবন। চারদিক থেকে মানুষের মিছিল সার বেঁধে ঢুকে পড়লো শহরে।

আর সেই সমস্ত মিছিলের ভগ্নাংশ হয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে চলতে লাগলো আমাদের অরবিন্দ। পাশেই ছিল কেলো-ফটিক। চেঁচাতে চেঁচাতে তার গলা ভেঙে এসেছে। তবু তার চেঁচানোর কামাই নেই।

অরবিন্দর দিকে নজর পড়তেই বললে—কী অরবিন্দবাবু, কী ভাবছেন, চেঁচান—

কিন্তু কীসের জন্যে চেঁচাবে, কার জন্যে চেঁচাবে, কার কানে গিয়ে সে চিৎকার

পেঁছাবে? কে সে? কোথায় তার বাড়ি? কে তার কাছে পেঁছোতে পারবে?

দিলীপদা বললে—তারপর?

অরবিন্দর চোখের সামনে থেকে আর সবকিছু মুছে এল। শুধু সামনে ভেসে উঠলো দিলীপদার মুখখানা। দিলীপ বেরা। যাদবপুরের 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র মালিক।

অথচ দিলীপদা না থাকলে সেদিন কে তাকে বাঁচাতো! ভেতরে যে এত কাণ্ড চলেছে তা কে জানতো!

আসলে সমস্ত কিছুর মূলে হচ্ছে ভূধরবাবু। ভূধরবাবু নাকি বড় করিৎ-কর্মা লোক। বাইরে বড় পরোপকারী, বড় অমায়িক। ভূধরবাবুর বাড়িতে যদি কেউ যায় তো তিনি বড় আপ্যায়িত হন।

বলেন—আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি, বলুন?

কলকাতার মানুষের সমস্যার তো শেষ নেই। তাদের সে সমস্যা-সম্ভার যদি কেউ দূর করতে পারে তো তিনি ভূধরবাবু। দ্বাপরের পতিতপাবন শ্রীমধুসূদনই বোধহয় এ-জন্মে ভূধর বিশ্বাস হয়ে কলিতে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

তিনি কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। বলেন—ঠিক আছে, আমি সব ঠিক করে দেব—

কারোর সিমেন্টের অভাবে বাড়ি তৈরি হচ্ছে না, কারো করপোরেশনের কাউন্সিলারকে ধরে ট্যাক্স কমাতে হবে, কাউকে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে ফ্রি-বেড পাইয়ে দিতে হবে, কারো আড়াই কাঠা জমি দরকার নিউ আলিপুরে, কারো থার্ড ডিভিশনে পাশ করা ছেলেকে মেডিকেল-কলেজে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে, কাউকে আমেরিকা যাবার ভিসা জোগাড় করে দিতে হবে—এই সব হাজারো সমস্যা কলকাতার মানুষের। এ-সব কাজ সাধারণ মানুষকে দিয়ে হবার উপায় নেই। এর প্রত্যেকটা কাজই দুরূহ। এর থেকে মাউন্ট এভারেস্টের চুড়োয় ওঠাও বোধহয় সোজা কাজ।

এমনি অগতির গতির কাছেই একদিন শিরীষবাবুকে টেলিফোন করতে হলো।

ভূধরবাবু বললেন- সে কী, আপনি কেন আসবেন, আমিই তো আপনার কাছে যেতে পারি—কী কাজ বলুন না—

—সাক্ষাতেই সব বলবো। কবে আসছেন?

—কবে আপনার সময় হবে বলুন?

—আপনার সময় হলেই আমার সময় হবে!

শেষ পর্যন্ত একটা দিন স্থির হলো! সেই নির্দিষ্ট দিনে দেখা হলো ভূধর-বাবুর সঙ্গে শিরীষবাবুর। এই মিলনটা বড় শুভ মিলন। বাঙলার গ্লাস-ইনডাসট্রির পক্ষে বড় শুভদায়ক। কাচ তো অনেক রকমই আছে। তাতে কোনও লাভ নেই কারো। বাজার ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। বাঙলার তৈরি গ্লাস এক-কালে বোম্বাইতে বিক্রি হতো, ম্যাড্রাসে বিক্রি হতো, দিল্লিতেও বিক্রি হতো। বাংলার মিলের কাপড়ও তাই। তারপর সেখানেও গ্লাস-ফ্যাক্টরি হলো, সেখানেও কটন-মিল হলো। মার্কেট ছোট হয়ে এল। আস্তে আস্তে ক্রমেই আরো ছোট হয়ে এল বাজার। তখন এইটুকু বাজারের মধ্যে গুঁতোগুঁতি চলতে লাগলো সকলের। কে কার মাল কাটাতে পারে! তারপর এখন এমন অবস্থা যে বাংলা-

দেশের বাইরে আর আমাদের মার্কেটই নেই।

ভূধরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে?

শিরীষবাবু বললেন—তাহলে অন্য রাস্তার কথা ভাবতে হবে।

—সেই অন্য রাস্তার কথা কিছু ভেবেছেন?

—ভেবেছি বৈকি। দিনরাত আমরা ওই কথাই তো ভাবি। ভেবে ভেবে একটা রাস্তা বার করেছি। চীফ মিনিস্টারকে দিয়ে আপনি তো লেক-টাউনে জমি জোগাড় করে দিয়েছেন। কিন্তু আর একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে--

—বলুন, কী কাজ?

শিরীষবাবু তাঁর সব প্ল্যানটা খুলে বললেন। 'কিপলেক্স' গ্লাসের নাম শুনেছেন? যাকে বলে আন-ব্রেকেবল গ্লাস। যে-কাচ ভাঙে না আর কী! সেই কাচ ম্যানুফ্যাকচার করতে গেলে একটা সলিউশন লাগে। সে এক রকমের আঠা। সেটা ইন্ডিয়াতে তৈরি হয় না। ফরেন-মাল। সেটা বিদেশ থেকে আমদানি করতে গেলে ইমপোর্ট-লাইসেন্স লাগে।

—আপনার ইমপোর্ট-লাইসেন্স দরকার, সেই কথাটাই সোজা করে বলুন না!

শিরীষবাবু বললেন—না, তার মধ্যে একটা কথা আছে—

—কী?

—সেই জন্যেই তো আপনাকে ডেকেছি ভূধরবাবু। নইলে তো আমি নিজেই সব কাজ হাঁসিল করতে পারতুম। আসলে হয়েছে কি, এক গুজরাটি ফার্ম মানু-ভাই দয়াভাই, তারা একচেটিয়া লাইসেন্স পেয়ে বসে আছে। তারা একলা মনো-পলি কারবার চালিয়ে সমস্ত ইন্ডিয়ার মার্কেটটা একেবারে ক্যাপচার করে বসে আছে, আর কাউকে সেখানে নাক গলাতে দিচ্ছে না!

—আপনি কি ইমপোর্ট-লাইসেন্সের দরখাস্ত করেছেন?

শিরীষবাবু বললেন—আরে দরখাস্ত করলে কি আর লাইসেন্স পাওয়া যায়? ইন্ডিয়া গভর্মেন্টের অফিসাররা কি অত সোজা চিজ? কিছু কাঠ-খড় না পোড়ালে সোজা পথে কিছু করবার জো আছে এখানে? নেহাৎ আপনার মত দু'একজন লোক আছেন তাই তবু দু'মুঠো খেতে পাচ্ছি, দশজনকে খাওয়াতেও পারছি—

তারপর একটু থেমে বললেন—হ্যাঁ একটা কথা, টাকা যদি কিছু লাগে আপনি মুখ ফুটে বলতে যেন লজ্জা করবেন না ভূধরবাবু, এটা এখন থেকে বলে রাখছি—

ভূধরবাবু ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন—আপনি গোড়াতেই টাকার কথা তুলছেন। এ-সব কাজ কি শুধু টাকাতে হয়? কলকাতায় তো হাজার হাজার লাখ-পতি কোটিপতি আছে, দেখি ক'জন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একটা রেশনের দোকানের লাইসেন্স বার করতে পারে? ক'জন কাল সন্ধ্যেবেলার মধ্যে একটা নতুন ট্যাক্সির পারমিট বার করে আনতে পারে? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি কোনও ব্যাটার সে মুরোদ নেই—

শিরীষবাবু একটু যেন আশা পেলেন। বললেন—তাহলে আপনি ভরসা দিচ্ছেন, পারবেন?

ভূধরবাবু বললেন—পারবো তো নিশ্চয়ই, কিন্তু ক'দিনের মধ্যে চাই আপনার, তাই বলুন?

শিরীষবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আপনি সত্যিই বলছেন পারবেন?

—অত কথার দরকার কী? আপনার ইমপোর্ট-লাইসেন্সটা পেলেই তো হলো মশাই—

—কিন্তু এ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্মেন্টের ব্যাপার নয়, একেবারে সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের ব্যাপার। ফাইন্যান্স মিনিস্টারের নিজের পোর্টফোলিও। ফরেন-এক্সচেঞ্জ এখন কাউকে দিচ্ছে না। ভয়ানক কড়াকড়ি করেছে।

—ওই তো বললুম, আপনার যেমন করে হোক পেলেই তো হলো। ভূধর বিশ্বাস সামান্য লোক বটে, কিন্তু তার খেলটা তো আর দেখেননি। এবার দেখে নিন!

—তাহলে বলছেন হবে?

ভূধরবাবু বললেন—জমির ব্যাপারেও আপনি বলেছিলেন হবে না। শেষে তো হলো? ষাট হাজার টাকার মধ্যেই তো সব করে দিলুম!

—সে অবিশ্যি আপনার জন্যেই হয়েছে, তা আমি হাজার বার স্বীকার করবো।

ভূধরবাবু বললেন—আর এ ব্যাপারে খুব বেশি লাগে তো লাখ পাঁচেক খরচা হবে সব জড়িয়ে।

শিরীষবাবু আশান্বিত হলেন। বললেন—লাখ পাঁচেক কেন, যদি ইমপোর্ট-লাইসেন্সটা পাই তো আমি লাখ আস্টেক পর্যন্ত খরচা করতে রেডি—

ভূধরবাবু বললেন—তা তো বটেই, আমাদের নতুন ফাইন্যান্স মিনিস্টার মশাই এসে তো আরো সুবিধে করে দিয়েছেন আপনাদের, এক্সপেন্ডিচার-ট্যাক্সই তুলে দিয়েছেন। সব টাকাটা আপনি ক্যাপিটালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারবেন, কোনও ঝঞ্ঝাট নেই—

শিরীষবাবু বললেন—তাহলে কবে আপনি আমাকে খবর দেবেন?

ভূধরবাবু বললেন—আমাকে দু'উইক টাইম দিন। আমি একবার দিল্লি ঘুরে আসি। তারপর আপনাকে সঠিক খবর দেব—

এ-সব গোড়ার দিকের কথা। শিরীষবাবুর জুয়েলারি আর ঘড়ির কারবার তখন আছে বটে, কিন্তু তার বাজার তখন ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। ক্রমে ক্রমে দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজে তখন আরো কয়েকটা কোম্পানী গড়ে উঠছে। তারাই শিরীষবাবুর বাজার ছোট করে দিচ্ছিল। শিরীষবাবু তখন ভেবে ভেবে এই মতলবটাই বার করলেন।

ভাবলেন—এবার বোম্বাই-এর মনোপলি ব্যবসা করা আমি দেখে নেব।

ভূধরবাবু তাঁর কথা রাখলেন। শিরীষবাবু টাকা দিলেন ভূধরবাবুর দিল্লি যাবার। সেখানকার থাওয়া-থাকা আর তদবির করবার বাবদ মোটা খরচাও তাঁর পকেটে পুরে দিলেন।

দমদম থেকে একদিন ভূধরবাবু ক্যারাভ্যাল-প্লেনে চড়ে বসলেন।

কলকাতায় যাদের গাড়ি আছে তারা খবর রাখে না তাদের গাড়ির কাচ কোথায় তৈরি হয়। বোম্বাইতে না দিল্লিতে না কলকাতায়। তাদের গাড়ি হলেই হলো। গাড়ির কাচ ভেঙে গেলে তারা কারখানায় গাড়ি ফেলে দিয়েই খালাস।

বিল করলেই চেক পাঠিয়ে দেয়!

কিন্তু শিরীষবাবুর বহুদিন আগেই মাথায় এসেছে আইডিয়াটা। টাকা উপায় করার নানান রকম আইডিয়া শিরীষবাবুর মাথায় দিনরাত আসে। দেশের আর্থিক অবস্থা বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে পয়সা উপায় করবার আইডিয়াও বদলাতে হয়। তার নামই হলো বিজনেস।

ভূধরবাবু সাতদিন পরেই চলে এলেন। ভারি খুশী খুশী ভাবটা।

বললেন—সব ব্যবস্থা করে এসেছি—

—লাইসেন্স পেয়ে গেছেন?

—দিল্লি থেকে লাইসেন্স দেবে কি মশাই? এনকোয়ারি হবে ক্যালকাটা থেকে, তবে তো! আপনার ফ্যাক্টরি দেখতে আসবে এখানকার অফিসের একজন ইনসপেক্টর, সে রিপোর্ট দিলে তবে লাইসেন্স আসবে দিল্লি থেকে।

—সে যদি খারাপ রিপোর্ট দেয়?

—তা যাতে না দেয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিরীষবাবু বললেন—সে ব্যবস্থা কে করবে? আমার ফ্যাক্টরি দেখলে তো রিপোর্ট খারাপই দেবে। আমার তো তেমন আপ্-টু-ডেট্ ফ্যাক্টরিই নেই—

ভূধরবাবু বললেন—খারাপ রিপোর্ট দেবে কেন? আপনি তো বলেছেন আপনি টাকা খরচ করতে রাজী!

—তা তো রাজী। কিন্তু দেব কী করে?

ভূধরবাবু বললেন—সে-সব ব্যবস্থাও আমি করে এসেছি, আপনাকে কিছছু ভাবতে হবে না। আমাকে এখন লাখখানেক টাকা দিয়ে দিন, যাকে যা দেবার আমি দিয়ে দেব। আপনি এখন শুধু একজন মোসাহেব গোছের লোকের ব্যবস্থা করুন, যে কেবল ইনসপেক্টরের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তার তোয়াজ করবে, তার তদবির করবে—

—সে আমার লোক আছে। তার জন্যে ভাবতে হবে না।

তা অদ্ভুত করিতকর্মা লোক বটে ভূধর বিশ্বাস। পৃথিবীর লোক জানতে পারলো না অন্ধকারের কোন্ সুড়ঙ্গ-পথে কার সঙ্গে কী ব্যবস্থা করে কী বন্দোবস্ত সমাধা হয়ে গেল। দিল্লির ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মিনিস্ট্রির ফাইলে কোন্ কারসাজিতে কোন্ কারচুপির জাল বিছোন হলো তাও কেউ জানতে পারলো না।

শুধু কলকাতার অফিসে সিল করা চিঠি এল বড় সাহেবের নামে। লিখেছে দিল্লি অফিসের সেক্রেটারি। জরুরী চিঠি। মেসার্স সো-এ্যান্ড-সো'র ফ্যাক্টরিতে গিয়ে যেন ইনসপেকসান করা হয়। করে রিপোর্ট দেওয়া হয় অবিলম্বে।

ভূধরবাবু হঠাৎ টেলিফোন করলেন শিরীষবাবুকে।

—হ্যাঁ আমি, চিঠি এসে গেছে। আপনার লোক রেডি?

শিরীষবাবু এদিক থেকে বললেন—হ্যাঁ রেডি।

—তাহলে বুধবার সকালবেলা ইনসপেক্টার আপনার ওখানে যাচ্ছে। আপনি গাড়ি আর লোক রেডি রাখবেন। তারপর যা করবার আমি করবো।

ফোন রেখে দিয়ে শিরীষবাবু ডাকলেন—গোস্বামী—

শিরীষবাবুর অফিসের বড় কনিষ্ঠ স্টাফ গোস্বামী। কনিষ্ঠ হলেও গোস্বামী শিরীষবাবুর বিশ্বস্ত কর্মচারী। গোস্বামীর তিন-পুরুষে কেউ

কখনও স্কুল-কলেজে যায়নি। স্কুল-কলেজে যাবার তাদের দরকারও হয়নি। স্কুল-কলেজে না গিয়ে যদি চলে তো সেখানে গিয়ে পয়সা খরচ করে লেখা-পড়া শিখে লাভটা কী? গোস্বামী বংশ কলকাতা শহরে বেঁচে-বর্তে আছে, খেতে-পরতে পাচ্ছে, এইটেই তো চরম প্রমাণ যে, লেখা-পড়ার কোনও দরকার নেই এ-যুগে। যদি বলো বড়লোক কেন হলুম না? যদি বলো কেন তাহলে পরের গোলামী করছি? তাহলে চেয়ে দেখ শিরীষবাবুর দিকে। শিরীষবাবুই বা কী এমন লেখা-পড়াটা শিখেছেন! আসলে ভাগ্য হে, ভাগ্য! কপাল যদি তোমার ফাটা হয় তো হাজার লেখা-পড়া শিখেও আমার মত মোসাহেবী করতে হবে!

ডাক পেয়েই গোস্বামী কর্তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। একটা নমস্কার করে দাঁড়ালো।

শিরীষবাবু বললেন—গোস্বামী, তোর মনে আছে তো যা-যা বলেছি?

—আজ্ঞে, মনে আছে!

—বুধবার, মানে আসছে পনেরো তারিখে কিন্তু ইনসপেক্টার আসছে। সেদিন একটু ফরসা জামা-কাপড় পরে আসবি। বুঝলি, না বুঝলি না? বুধবার, মনে থাকবে তো?

কী কী করতে হবে ইনসপেক্টার এলে সব বুঝে নিয়ে গোস্বামী আবার নিজের সেকশানে গিয়ে বসলো। এ-রকম আগেও অনেকবার অনেক অদ্ভুত কাজের ভার পড়েছে গোস্বামীর ওপর। আগেও অনেকবার ইনসপেক্টর এসেছে। আগেও কর্তা ঠেকিয়ে দিয়েছেন এই গোস্বামীকেই। শিরীষবাবুর ফ্যাক্টরিতে এই গোস্বামীরা ছোট-খাটো এক-একটা নাট-বলটু ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এদের কৃপাতেই ফ্যাক্টরিগুলো নির্বিঘ্নে চলছে। এদের কৃপাতেই কলকাতার রাস্তার আলো, কলের জল, ইলেকট্রিক আলো চালু রয়েছে। এদের দাক্ষিণ্যেই ভদ্রলোকেরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবার নিয়ে কলকাতা শহরে নিরাপদে বাস করছে। এরাই অন্ধকার, এরাই আবার আলো। এদের চাকরি না দিলে শিরীষবাবুর গাড়ির চাকা অচল হয়ে যায়। আসলে এরা নিজেরা হলো এই শহরের ডাস্টবিন।

ডাস্টবিন নিজের সেকশানে এসে চুপ করে বসে একটা বিড়ি ধরালো। তারপর বুধবারের কথাটা কল্পনা করে একবার ধোঁয়া ছাড়লো। তারপর 'দেৎ' বলে বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চাপরাশিটাকে ডাকলে।

চাপরাশিটা আসতেই বললে—এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয় তো শক্তি, শালা বিড়ি খেতে আর ভাল্লাগে না—

শক্তিপদ জিজ্ঞেস করলে—কী সিগারেট

—খুব ভালো সিগারেট, মানে খুব দামী! যা—

বুধবারিরা চলেছে চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে। ডান দিকে মাঠ, আর বাঁ দিকে রাস্তা। চওড়া পিচ ঢালা রাস্তা।

—উ ক্যা মোকান রে বুধবারি?

বুধবারি মোকানটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিলে।

—দফতর, সাহাব লোগকা দফতর।

মুখ ঘোরাতেই দেখলে এক জোড়া সাহেব-মেম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের

দিকে দেখছে। হাতে আবার একটা কী রয়েছে। তাদের দিকেই তাগ করছে সাহেবটা।

—ও কেয়া কর্ রহা হ্যায় বুধবারি।

—ফটো খিঁচ রহা হ্যায়!

বুধবারি জয়চণ্ডীপুরে ফোটো তোলা দেখেছে। কোলিয়ারির সাহেবরা গাড়িতে করে জয়চণ্ডীপুরে যেতে যেতে যা দেখতে পায় তার ফোটো তুলে নেয়। কতবার বুধবারিকে আধ-ন্যাংটো হয়ে চুপ করে দাঁড়াতে বলেছে সাহেবরা। বুধবারি কোমরের কাপড়টা একেবারে জঙ্ঘা পর্যন্ত তুলে কাঁধে কোদাল নিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর লালমুখ সাহেবরা তার ছবি তুলে নিয়েছে।

—পয়সা?

বুধবারি জানতো তার ছবি তুললে সে পয়সা পাবে। বলতো—হুজুর —পয়সা?

ঝনাৎ করে একটা আধুলি কি সিকি ফেলে দিয়ে সাহেবরা হুল্লোড় করতে করতে চলে যেত!

পাঁঠাটা কাঁধে নিয়ে বুধবারি হাসি-হাসি মুখ করে ক্যামেরার দিকে চেয়ে রইল। ফোটো তোলার ব্যাপার এক মিনিটের ব্যাপার। সেটা জানতো বুধবারি। ফোটো তোলা হয়ে গেলে বুধবারি হাতটা সামনের দিকে পেতে বাড়িয়ে দিলে-পয়সা?

সাহেব আর মেমসাহেব হাসতে লাগলো। জুডি হবসন জানে এরা ভিখিরির জাত। এ রেস অব বেগারস্। আমেরিকার কাছে, ব্রিটেনের কাছে, রাশিয়ার কাছে ভিক্ষে করে এদের পেট চলছে। দিস ইজ ইণ্ডিয়া, দিস ইজ বেঙ্গল, দিস ইজ ক্যালকাটা।

হঠাৎ ওদিক থেকে একটা চিৎকার কানে আসতেই জুডি চেয়ে দেখলে।

—লুক, লুক, ক্লারা—ওই একটা প্রোসেশান আসছে—

মিছিলের সামনে লাল ফেস্টুন। ফেস্টুনের ওপরে ভার্নাকুলারে বড় বড় অক্ষরে কী সব লেখা রয়েছে। হৈ হৈ করে চিৎকার করছে। শ্লোগান দিচ্ছে।

—বয়, ওরা কী বলছে? হোয়াট ডু দে সে?

পেছনে দাঁড়ানো বয়টা বুঝিয়ে দিলে মানেগুলো। বললে—ওরা বলছে-ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

মিছিল তখন সার বেঁধে এগিয়ে আসছে।

মজুতদারের শাস্তি চাই।
সস্তাদরে খাদ্য চাই।
মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও।
নইলে গদী ছেড়ে দাও।

জুডি হবসন তাড়াতাড়ি ক্যামেরাটা বাগিয়ে নিলে। ঠিক ফোকাস করে নিয়ে ফোটো তুলে নিতে লাগলো একটার পর একটা। খুব লম্বা মিছিল। সাউথ থেকে নর্থের দিকে যাচ্ছে।

ক্লারা জিজ্ঞেস করলে—ওরা কোথায় যাচ্ছে জুডি? কোথায় যাচ্ছে ওরা?

জুডি ফোটো তুলতে তুলতে বললে—ওরা সবাই গভর্নরস-হাউসের দিকে যাচ্ছে

—গভর্নরস-হাউসে গিয়ে কী করবে?

—দে উইল স্কোয়াট দেয়ার। ওখানে রাস্তায় বসে পড়বে।

—তারপর?

—তারপর পুলিশ ওদের বাধা দেবে। লাঠি মারবে। টিয়ার-গ্যাস ছুঁড়বে। তারপর ফাইটিং সুরু হবে—

—তারপর?

—তারপর বাস-ট্রাম পুড়িয়ে দেবে, আগুন জ্বলবে শহরে—ক্যালকাটা-সিটি তখন একটা ব্যাটল-ফিল্ড হয়ে উঠবে।

ক্লারা বললে—তুমি এত জিনিস জানলে কী করে জুডি? হাউ ডু ইউ নো? আগে কখনও ক্যালকাটায় এসেছিলে নাকি?

—না, আমার আনকেল যে সব বলেছে আমাকে। আনকেল ছিল বেঙ্গল গভর্নরের মিলিটারি সেক্রেটারি। আমার আনকেলের সময় কংগ্রেস-পার্টি ঠিক এই রকম করেছে, এখন কংগ্রেস এখানে রুলিং পার্টি, অন্য পার্টিরা আবার এখন সেই একই ট্যাকটিক্স ধরেছে—

নিচেয় রাস্তার ওপর তখন তুমুল শোরগোল। হাজার-হাজার মানুষের গলার শব্দে তখন স্ট্র্যান্ড হোটেলের ব্যালকনি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

গ্লাস-ফ্যাক্টরির গোস্বামীকে মাঝে মাঝে স্ট্র্যান্ড হোটেলে আসতে হয়। সেদিন তার পোশাক-পরিচ্ছদ অন্যরকম থাকে। সেদিন সেলুনে গিয়ে দাড়িটা কামিয়ে মুখে স্নো-ক্রীম মাখতে হয়। সেদিন আর পাড়ার লোক চিনতে পারে না তাকে।

বলে—কী গোস্বামীদা, আর যে তোমাকে চিনতে পারা যাচ্ছে না?

গোস্বামী বলে—বড়বাবুর হুকুম, আর কী করবো বলো?

—তা সাহেবেরই গাড়ি বুঝি?

গাড়ি যে সাহেবের তা গাড়ির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। শুধু গাড়ির চেহারাই নয়, ড্রাইভারের চেহারা-পোশাকও সেই রকম। এই গোস্বামীকেই পাড়ার লোক একদিন খালি পায়ে খালি গায়ে ঘুরতে দেখেছে। এমন একদিন গেছে যেদিন সামান্য চুল কাটবার পয়সাও ছিল না। ভাত খেতে পাক আর না-পাক বিড়িটা খেত ফুঁক ফুঁক করে। তখন এ-বাড়ির বৌদি, ও-বাড়ির মাসিমা লুকিয়ে লুকিয়ে গোস্বামীকে পয়সা দিয়েছে এটা-ওটা কিনে আনতে। কারো সিনেমার টিকিট কিনতে হলে গোস্বামীকে টাকা দিত। গোস্বামী গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনে এনে বৌদি-মাসিমাদের দিত। দুপুরবেলা সেই টিকিট নিয়ে তারা সিনেমায় যেত। তার বদলে সিকিটা-পয়সাটা যখন যা দরকার হতো গোস্বামীর, তা তারা দিত।

কিন্তু সেই গোস্বামীরই একদিন কোন্ এক ফ্যাক্টরিতে চাকরি হলো। তখন

বিয়ে করলো গোস্বামী। ছেলেমেয়ে হলো। তারপর পায়ে ভালো জুতো উঠলো. গায়ে ভালো সার্ট উঠলো। মাঝে মাঝে বিড়ি ছেড়ে দিয়ে আবার দামী সিগারেট খেতেও দেখা গেল তাকে।

গোস্বামী বলতো—ভাই, সাহেবের কাজে বড় বড় জায়গায় যেতে হয়, সাজ-পোশাক ভালো না হলে আর চলে না—

—কোথায় যেতে হয় তোমাকে গোস্বামীদা ?

—তা কি বলা যায় ভাই ? যখন যেখানে হুকুম হয় সেখানেই যেতে হয়। হয়ত রাজভবনেও যেতে হয়—

রাজভবনে যেতে হয় শুনে সবাই অবাক হয়ে যেত। বলতো—রাজভবনে কী করতে যেতে হয় রে বাবা ?

গোস্বামী বলতো—তা বড় বড় হোমরা-চোমরা লোকদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে রাজভবনে যেতে হবে না ? তোমরা কোথায় আছো ?

—আর কোথায় যেতে হয় ?

—স্ট্র্যান্ড-হোটেল দেখেছ ? অন্তত নাম শুনেছ ? চৌরঙ্গী. পার্ক স্ট্রীট, কত জায়গার নাম বলবো ?

লোকেরা আরো অবাক হয়ে যেত। বলতো—স্ট্র্যান্ড হোটেলের ভেতরেও তুমি ঢুকেছ গোস্বামীদা ?

—আরে, ভেতরে না গেলে কি শুধু শুধু বলছি ?

—ওখানে তো সবাই মদ খায়। তুমি মদ খাও ?

গোস্বামী বলতো—আরে তোরা সবাই এক-একটা আস্ত গাড়োল। মদ না খেলে ওখানে ঢুকতেই দেবে না তোদের। বলবে মদ না খেলে তুমি ভদ্দরলোকই নও—

লোকেরা সাহস পায়। তারাও মদটা-আশটা খায়। খালাসীটোলায় কি ময়ূরভঞ্জ রোডের দিশি মদের দোকানে ভাঁটিখানায় লুকিয়ে লুকিয়ে মাটির ভাঁড়ে চুক করে চুমুক দিয়েই তেলে ভাজা চিবোতে চিবোতে ছাতার আড়াল দিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু প্রকাশ্যে সকলের সামনে আলোর তলায় টেবিলে মদ খাওয়া কারোর কপালে নেই। সে আলাদা আরাম।

গোস্বামী বলতো—আমি কি আর একলা খাই রে. বড় বড় গভর্মেন্টের অফিসার. খাস বিলিতি সাহেব-সুবোদের সঙ্গে বসে খাই।

—অনেক দাম বুঝি বিলিতি মদের ?

গোস্বামী বলতো—আরে দূর, আমার পয়সায় খাই নাকি। আমার বড়-সাহেব খাওয়ায়. যার এই গাড়ি. যার গাড়ি চড়ে বেড়াই. সেই সাহেবই তো আমাকে খেতে শিখিয়েছে রে। সাহেব বলে—খাও গোস্বামী. আর একটু খাও—

—সাহেব তোমার খুব ভালো লোক তো গোস্বামী!

—আরে, লোক নয়, দেবতা, দেবতা—

গোস্বামীর কথা কারো অবিশ্বাস হবার মত নয়। নইলে গোস্বামীদা অত বড় গাড়ি চড়ে বেড়ায়ই বা কী করে! সিগারেট বা খায় কী করে। সিগারেটের কি কম দাম ? অথচ এই কিছুদিন আগেও গোস্বামীদা ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতো. গোস্বামীদের পৈতৃক বাড়িটা তো ভেঙে ভেঙে পড়তো। তিন-চার

পুরুষ আগে কে একজন পূর্বপুরুষ ওই দালানটা করে গিয়েছিল বলে মাথা গোঁজবার যা-হোক কিছু একটা ছিল। নইলে কী করতো গোস্বামী?

হরিতকী বাগান লেনটা যেখানে বেঁকে গিয়ে বিডন স্ট্রীটে মিশেছে, তার পাশেই একখানা বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে গাড়িটা থামলো।

পাশের জানালা দিয়ে সুরমা গাড়িটা দেখতে পেয়েছে। ডকলে—ও ঠাকুরপো, ঠাকুরপো—

গোস্বামীরও বৌদিকে দেখতে পেয়ে একগাল হাসি। বললে—কী বৌদি, দাদা কোথায়? লেখাপড়া করছে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সুরমা বললে—তোমাকে আর চেনাই যায় না যে ঠাকুরপো, বেশ আরাম করে গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছো—

—আর বোল না বৌদি, আমি না হলে যেমন সাহেবের চলে না, আবার সাহেব না হলে তেমনি আমারও চলে না। এই যেতে হবে এখন বরানগরে।

—কেন, বরানগরে কেন?

—আর বলো কেন, সাহেব যেমন মোটা মাইনে দেয়, তেমনি খাটিয়েও নেবে তো! আমি না হলে তো ফ্যাক্টরি চলবে না। আমিই তো সব কি না। ফ্যাক্টরি তো সাহেবের, কিন্তু চাবি-কাঠি তো সব আমার হাতে!

সুরমা পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে। কত বছর হলো কলকাতায় এসেছে। এই গলি-টার ভেতর সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটা বলিষ্ঠ আশায় বুক বেঁধে বাস করে আসছে। ছোট একখানা ঘরের ভাড়াটে, সুখের মুখ দেখে তার তৃপ্তি হয় না। বড় রাস্তার হৈ-চৈ-আওয়াজ শুধু কানে আসে। রাস্তা থেকে মিছিলের শব্দ শুনে জানলাটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করে। খুব যদি সাহস হয় তো দু'পা বাড়িয়ে মোড়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়ায়! আড়াল থেকে দেখে হাজার-হাজার লোকের মিছিল চলেছে। ছেলে-মেয়ে সব একাকার—

সবাই চিৎকার করছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

সুরমার বেশ লাগে। কথাটার মানে কেউ জানে না। আশেপাশের বাড়ি থেকে অন্দর মহলের বৌ-ঝি-ঝিউড়ি সবাই ঝুঁকে পড়ে মজা দেখতে বেরিয়েছে।

মজুতদারের শাস্তি চাই
সস্তা দরে খাদ্য চাই।
মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও।
নইলে গদী ছেড়ে দাও।

আগে আগে বিয়ের বর-কনে দেখতে যেমন ভিড় করতো এ-পাড়ার ছেলে-মেয়েরা, এখন এই মিছিল দেখতেও ঠিক সেই রকম। ওমা ছেলে-মেয়ে সব এক সঙ্গে যাচ্ছে যে গো! এও এক অভিজ্ঞতা সুরমার। সহরে এসে এও এক রকম নতুন ধরনের মজা দেখতে পাওয়া। নিরঞ্জন এক গাদা খাতা-বই-পত্র নিয়ে ঘামতে ঘামতে যখন বাড়ি এসে হাজির হয় তখন রাস্তায় গ্যাসের বাতি জেলে দিয়েছে।

এসেই বলে—জানো, আজকে কী কাণ্ড?

কাণ্ড যে এ-পাড়াতেও হয়েছে তা শোনবার আগেই নিরঞ্জন নিজের কাণ্ডটার কথা বলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে—আজকে হঠাৎ একখানা ভালো বই পেয়ে গিয়েছি—জানো সুরমা—

—ভালো বই? সিনেমা? সুরমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—না না, সিনেমা দেখবো আমি? তুমি যে কী বলো। সিনেমা দেখবার সময় আমার আছে? বলে খাতাপত্তোর টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে আবার বলে—আজকে একটা নতুন বই-এর সন্ধান পেয়েছি, বুঝলে, নতুন ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট! একজন ভদ্দরলোকের কাছে রয়েছে।

—কী, জিনিসটা কী?

নিরঞ্জন বললে—মানে পুরোন একটা তালপাতার পুঁথি।

—তালপাতা? তালপাতা নিয়ে কী করবে?

—সে তুমি ঠিক বুঝবে না। আমার তো মনে হলো পুঁথিখানা বৌদ্ধযুগের, যদি খাঁটি জিনিস হয় তো একটা শোরগোল পড়ে যাবে বাজারে—বুঝতে পারলে না?

সুরমা কিছুই বুঝতে পারছিল না। তালপাতার পুঁথির সঙ্গে বাজারে শোরগোল পড়ে যাওয়ার কী সম্পর্ক তা তার মাথায় ঢুকছিল না।

জিজ্ঞেস করলে—সবাই বুঝি কিনতে চাইবে সেখানা?

নিরঞ্জন বললে—নিশ্চয়ই, এখনি যদি কেউ জানতে পারে পুঁথিখানার কথা তো সবাই তা কেনবার জন্যে হুড়োহুড়ি করবে! সেইজন্যেই তো কাউকে জিনিসটা বলছি না।

—তা পুঁথিখানা কিনে কী করবে তারা?

—ধরো, আমি যদি পাই পুঁথিখানা তো প্রমাণ করে দেব যে বাঙলা ভাষা দু'হাজার বছরের পুরোন ভাষা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করে প্রমাণ করেছিলেন আমাদের এই বাঙলা ভাষা আজ থেকে এক হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল। পুঁথিটা পেলে রিসার্চ করে তখন আমি আবার প্রমাণ করে দেব, না তাত নয়। শাস্ত্রী মশাই-এর চর্যাপদের আগে আফগানিস্থানে দু'হাজার বছর আগে আদি বাঙলা ভাষার অস্তিত্ব ছিল—

—তাতে কী হবে?

—তাতে কী হবে বুঝতে পারছো না? তখন প্রমাণ হবে আমার গবেষণাই খাঁটি, শাস্ত্রী মাশাই-এর গবেষণার চাইতেও খাঁটি। এখন মুশকিল হচ্ছে টাকা নিয়ে—

—টাকা?

নিরঞ্জন বললে—টাকা হলে ম্যানাসক্রিপ্টটা কিনে নিতাম!

সুরমা বললে—ও সব পুরোন কাগজ কিনে কী লাভ? তাতে তোমার কলেজে মাইনে বাড়বে?

নিরঞ্জন হাসলো। বললে—মাইনে বাড়াটাই কি সব?

—সব নয়? তুমি যে কি বলো? মাইনে হলে একটা ভালো শাড়ি কিনতুম, অনেক দিন থেকে আমার একটা কাঞ্জিভরমের শাড়ি কেনবার সাধ, টাকার জন্যেই তো হচ্ছে না—পাশের বাড়ির মাসিমার মেয়ে একটা কিনেছে সেদিন, বড় সুন্দর দেখতে—

নিরঞ্জন বললে—এই তো সেদিন তোমাকে একটা শাড়ি কিনে দিলুম—

—বারে, সে তো ধনেখালি। কাঞ্জিভরম আমি কিনেছি কখনও?

—তা ধনেখালিও তো খারাপ নয়।

সুরমা বললে—তুমি যে কী বলো, ধনেখালি পরে আমি কোথাও বেড়াতে যেতে পারি? এই যে সেদিন ও-পাড়ায় ভাদুড়ীদের বিয়ের নেমন্তন্ন হলো, আমি সেই বিয়ের সময়কার মান্ধাতার বেনারসী-শাড়টা পরে গেলুম। আমার এমন লজ্জা করছিল যে কী বলবো। আমি যদি খারাপ শাড়ি পরি তো তাতে তোমারই তো বদনাম, লোকে তো তোমাকেই দুষবে, তোমাকেই লোকে গরীব বলবে। আমার আর কী!

নিরঞ্জন বললে—তা বলুক গরীব, গরীব বললে আমার কিচ্ছু লজ্জা নেই—

সুরমা রেগে গেল। বললে—তোমার লজ্জা না করতে পারে বটে, কিন্তু আমার লজ্জা করে। কেউ যদি আমাকে বলে টাকার অভাবে আমি শাড়ি কিনতে পারি না, তাতে আমার খুব গায়ে লাগে—

—কেন? গরীব কি তুমি কলকাতায় একলা? আর কোনও গরীব লোক নেই পাড়ায়?

সুরমা বললে—আমাদের মত গরীব কে আছে শুনি? সক্কলের কত শাড়ি আছে জানো? ওই তো মাসিমার মেয়ে, ওই তো এক ফোঁটা বয়েস, ওর আলমারিতে সেদিন বত্রিশটা শাড়ি দেখালে।

এর আর উত্তর দিতে পারে না নিরঞ্জন। সামান্য শাড়ি-টাকা-গয়না নিয়ে কেন যে মানুষ মাথা ঘামায় তাও বুঝতে পারে না সে। আস্তে আস্তে গায়ের জামাটা খুলে আলনায় রেখে দেয়। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার বইখানা নিয়ে বসে। দু'হাজার বছর আগেকার বাঙলা ভাষার নমুনা খুঁজে চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করে। ক্রিয়াপদের রকমফের নিয়ে তুলনা করে। ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে ডুবে যায়। কারক বিভক্তি আর সন্ধি।

রাত্রে শুতে এসে সুরমা বলে—তুমি এখন আলো জ্বেলে লেখা-পড়া করবে নাকি?

তা নিরঞ্জনের রাত জাগতেও ক্লান্তি নেই। ওই কারক-বিভক্তি আর সন্ধির মধ্যেই নিরঞ্জন দিন-রাত ডুবে থাকতে ভালোবাসে। তারপর কখন সে ঘুমোয় তা আর সুরমা টের পায় না। ভোর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে সুরমা উনুনে আগুন দেয়। তখন আর কথা বলবারও সময় থাকে না নিরঞ্জনের। তাড়াতাড়ি গরম গরম ভাত নাকে-মুখে গুঁজে নিরঞ্জন গোবরডাঙ্গায় চলে যায়। সেখানেই তার কলেজ। তখন আর কোনও কাজ থাকে না সুরমার। তখন যে সে কী করবে তার ঠিক পায় না। খানিক গড়িয়ে নেয় বিছানায়, খানিক পাশের বাড়ির মাসিমার কাছে গিয়ে গল্প করে। শাড়ির গল্প, গয়নার গল্প, রান্নার গল্প। তাতেও যখন ক্লান্তি আসে, তখন গলির ধারে জানালাটার কাছে এসে বসে। কচিৎ কদাচিৎ দু'একটা লোক হেঁটে যায় রাস্তা দিয়ে। তাতেই বৈচিত্র্য আসে। আর নয়ত এক-একদিন মিছিল বেরোয়। সেই শব্দগুলো কানে এলেই বেশ লাগে

মজুতদারের শাস্তি চাই,
সস্তাদরে খাদ্য চাই।
মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও—
নইলে গদী ছেড়ে দাও।

আর হঠাৎ এক-একদিন বিরাট একটা গাড়িতে চড়ে গোস্বামী ঠাকুরপো এসে নামে। তখন জিজ্ঞেস করে—কী ঠাকুরপো, আজকে আবার কোথায়?

গোস্বামী বলে—আজকে একবার হোটেলে যেতে হবে, বৌদি—

—হোটেলে? হোটেলে কী করতে ঠাকুরপো? বাড়িতে রান্না হয়নি নাকি?

—দূর, বাড়িতে তো সেই শাক-চচ্চাড়ি রান্না হয়েছেই, কিন্তু হোটেলে খেতে যাবো না, খাওয়াতে যাবো। বড় বড় সব লোক আসবে শিরীষবাবুর।

—তুমি বেশ আছো ঠাকুরপো, সত্যিই বেশ আছো!

গোস্বামী বললে—কী যে বলো বৌদি তুমি, চাকরির জন্যে আমাকে সব করতে হয়। যে-মনিব খাওয়ায় পরায়, যে যা বলবে তা-ই তো করতে হবে!

সুরমা বললে—তা তোমার তো আর সে-জন্যে নিজের পয়সা খরচ হচ্ছে না ঠাকুরপো?

—না, তা হয় না। উল্টে মনিব আমার জন্যেই পয়সা খরচ করবে। এই যে এখন হোটেলে যাচ্ছি, এখন আমার কাছে পাঁচশো টাকা দিয়ে দিয়েছে, এই দেখ না—

বলে পকেট থেকে পাঁচটা একশো টাকার নোট বার করে দেখালে।

তারপর নোটগুলো আবার পকেটে রেখে দিয়ে বললে—এই সবগুলো টাকাও যদি খরচ করে ফেলি তো কেউ তার জন্যে জবাবদিহি চাইতে আসবে না। আমার যেমন খুশী তেমনি খরচ করবো।

—সত্যি তুমি বেশ আছো ঠাকুরপো। তোমার মত যদি পুরুষ মানুষ হতুম আর তোমার মতন অমনি চাকরি করতুম তো বেশ হতো। বেশ হতো। তা না, কেবল একখানা ঘরের মধ্যে বাঁধা থাকতে আর ভাল্লাগে না আমার, সত্যি বলছি—

গোস্বামী হাসে। বলে—তা তুমি যদি যাও একদিন তো তোমাকে নিয়ে যেতে পারি বৌদি—

—ওমা, তোমার মনিব কিছু বলবে না তাতে?

গোস্বামী বলে—বলবে আবার কী? জানতে পারলে তবে তো! তোমাকে নিয়ে অনেক দূর ঘুরে আসবো। চলো, চন্দননগর চলো, রাঁচি চলো, হাজারিবাগ চলো—যেখানে খুশী তোমার চলো না—যাবে?

সুরমা বললে—এই ধরো তোমার দাদা কলেজে চলে যাবার পর যদি যাই?

—হ্যাঁ, তাও যেতে পারো।

—আর তারপর তোমার দাদার ফিরতে তো সেই রাত আটটা ন'টা। তার আগে ফিরে এলেই চলবে।

গোস্বামী বললে—তাহলে কবে তুমি যাবে বলো বৌদি?

সুরমা বললে—যেদিন তোমার খুশী ঠাকুরপো—

তারপর একটু গলাটা নিচু করে বললে—কিন্তু দেখো ঠাকুরপো, কেউ যেন জানতে না পারে!

গোস্বামী শিরীষবাবুর গ্লাস-ফ্যাক্টরিতে বহুদিন কাজ করছে। এ-সব কথা যে কাউকে বলতে নেই তা সে ভালো করেই জানে। তবু ভদ্র গেরস্থঘরের মেয়েদের প্রথম-প্রথম একটু ভয় করে বৈকি। ভয় করা ভালো। ভয়-করা মেয়েদেরই তো চায় মানুষ। একেবারে হা-হা করা মেয়ে সাপ্লাই করলে শিরীষবাবুর কাজ হাসিল

হয় না।

গোস্বামীর তখন দেরী হয়ে যাচ্ছিল। সুরমাকে কথা দিয়ে সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

আগে, অনেক আগে ইন্ডিয়াকে ওরা বলতো ব্যাকওয়ার্ড কান্ট্রি। তাতে ইন্ডিয়ার মনে ঘা লাগতো। অপমান বোধ করতো ইন্ডিয়া। পরে তাকে বদলে বলতে লাগলো আন্ডার-ডেভেলপ্ড্ কান্ট্রি। কিন্তু তাতেও যুত হলো না। ইন্ডিয়ানদের ইজ্জতে আঘাত লাগতে লাগলো। তারা বললে—না হুজুর, আমরা এখন স্বাধীন হয়েছি, আমরা এখন রোলস্-রয়েস চড়ছি, আমাদের অ্যামব্যাসাডাররা এখন সব দেশে গিয়ে সমানে-সমানে তাল রেখে চলছে, এখনও তোমরা কেন আমাদের নিচু চোখে দেখছো। ও-নাম বদলে দাও।

তারপর নতুন নাম হলো ডেভলপিং কান্ট্রি। অর্থাৎ অগ্রসরমান। অগ্রসর ধাতুর সঙ্গে সানচ প্রত্যয় করে একটু ইজ্জৎ বাড়িয়ে দিলুম তোমাদের। কিন্তু টাকা তোমাদের ধার নিতেই হবে। তোমরা যে রাতারাতি আমাদের ব্লক ছেড়ে আবার রাশিয়ার কাছে হাত পাতবে তা হতে পারবে না।

এরা বললে—আজ্ঞে হুজুর, তাহলে আমরা আর স্বাধীন হলুম কোথায়?

হোয়াইট-হাউস বললে—ঠিক আছে, তাহলে এক কাজ করো। আমরা যে পাউডার-মিল্ক দেবো, গম দেবো, চাল দেবো, তার জন্যে তোমাদের চড়া হারে সুদ দিতে হবে—

—আজ্ঞে তা কী করে দিতে পারবো। আমরা যে বড় গরীব।

—তা হলে বেশ তো মজা। ধারও নেবে সুদও দেবে না, তা তো হয় না। এসো এক কাজ করি। তোমাদের ফাইন্যান্স-মিনিস্টারকে আমাদের এখানে একবার পাঠিয়ে দাও, তার সঙ্গে একবার পরামর্শ করি। তিনি এখানে আসবেন, এখানে আমাদের স্টেট-গেস্ট হয়ে থাকবেন। তারপরে আলোচনা হলে যা ফয়শালা হবে তাতে সই করে দেবে তোমাদের ফাইন্যান্স-মিনিস্টার—

তা এই-ই হলো সূত্রপাত। সেই হোয়াইট-হাউসের তৎকালীন ভাগ্যবিধাতা আইসেনহাওয়ারের সময়েই ইন্ডিয়া থেকে মোরারজী দেশাই সাহেব গেলেন কনফারেন্স করতে। বড় গোপন, বড় অন্তরঙ্গ সে কনফারেন্স। এত অন্তরঙ্গ যে বাইরের লোকের কানে তা যাওয়া বিপজ্জনক। ও-সব ডিপ্লোমেটিক সলা পরামর্শ বড় গোপনেই হয়ে থাকে বরাবর। শুধু ইন্টারন্যাশন্যাল পরামর্শই নয়, কলকাতার যত রকমের যত কিছু পরামর্শ সবই গোপনীয়। 'ইন্টারন্যাশনাল গ্লাস ফ্যাক্টরি'র মালিক শিরীষবাবুও যে 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভান্ডারে'র দিলীপ বেরার সঙ্গে পরামর্শ করে তাও কনফিডেন্সিয়াল।

দিলীপ বেরা জিজ্ঞেস করেছিল—হারান নস্কর লেনে গিয়েছিলেন নাকি শিরীষবাবু?

শিরীষবাবু বললে—আরে না হে দিলীপ, তুমি আমাকে পাঠালে বটে,

আমিও ভেবেছিলুম শাঁসালো পার্টি, কিন্তু নাঃ—

—না মানে ?

—না মানে একেবারে টাকাটাই জলে গেল। জিনিসটা বড় রোগা, একেবারে হাড় বেরোন। আমি গেছি ফুর্তি করতে। গিয়ে দেখি একটা কেলে-কুচ্ছিৎ হাড়-জিরজিরে মেয়ে বসে বসে ঠাকুর-দেবতার বই পড়ছে—

দিলীপ বেরা অবাক হয়ে গেল—ঠাকুরদেবতার বই ? বলেন কী ?

—আরে হ্যাঁ হে, জিজ্ঞেস করলাম কী বই ? মেয়েটা বললে—শ্রীকান্ত ঠাকুরের জীবনী। অর্থাৎ ধর্মের উপদেশ-টুপদেশ আর কী ! দেখেই তো রক্ত জমে বরফ হয়ে গেল।

দিলীপ বললে—কেন, ওর একটা ধাড়ি বোন ছিল যে, বোনটা আসেনি ? বোনটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না ?

—আরে না হে, আমি কতবার বললাম আপনার সিসটারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন। তা বলে কী জানো ? বলে আমার সিসটার কলেজে গেছে—

—রাত্তির বেলা কলেজে ?

—তাই বলে কে ? অথচ তুমি যা বলেছিলে আমি তা-ই করেছি। রাবড়ি পাওয়া যায় না, আমি তোমাকে অর্ডার দিয়ে স্পেশাল রাবড়ি করিয়ে নিয়ে গেলুম ওর অন্ধ মা'র জন্যে, সব বরবাদ হয়ে গেল।

দিলীপ বললে—তা তারপর কী হলো তাই বলুন—

—তারপর আর কী করবো, বাড়ি চলে এলুম। তোমার কথা শুনেই ওখানে গিয়েছিলুম, নইলে ওসব বাজে জায়গায় আমি কখনও যাই ? তুমিই বললে গরীব গেরস্থ লোক, টাকার অভাবে সংসার চালাতে পারে না, বোনটার বিয়ে দিতে পারছে না ; তুমিই তো রেকমেন্ড করলে—

দিলীপ বেরা বললে—তারপর আপনি চলে এলেন ?

—না, আমি অমনি ছাড়িনি। আমি তক্কে তক্কে থাকতে লাগলুম। আমার ওখানে গোস্বামী আছে, চেনো তো ? সেই গোস্বামীকে একদিন কাজে লাগালুম। বললুম, তুমি খবর নাও তো গোস্বামী, ও মেয়েটা কোথায় যায়, কোন্ কলেজে পড়ে, কার সঙ্গে ঘোরে, অত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকে...

—তারপর ?

—তারপর সব খবর পেলাম হে। কলেজ-ফলেজ সব বাজে কথা। আসলে ভাড়া খাটে হে !

—কী রকম ? কী রকম ?

—হ্যাঁ হে, একদিন স্ট্র্যান্ড-হোটেলের মধ্যে দেখা। আগে একটুখানি মুখটা দেখা ছিল, তাই তখ্খুনি চিনে ফেললুম। বললুম—আপনার নাম সুসী না ? বলতেই তেড়ে এল আমার দিকে। বুঝলে হে, একেবারে তেড়ে এল আমার দিকে— .

—তাই নাকি ? আপনি কী করলেন ?

শিরীষবাবু বললেন—ব্যাপারটা বুঝলাম।

—কী ব্যাপার ?

—সঙ্গে একজন ইয়ং-ম্যান রয়েছে, বুঝলাম ভাড়া খাটছে। বুঝে আর কিছু

বললাম না, চুপ করে রইলুম। তারপর নিজের সম্মান নিজেই রেখে চলে এলুম ভাই। শেষকালে হোটেলের ভেতরে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে যাবে, তাই আর কিছু বললুম না।

দিলীপ বেরা বললে—আপনি কিছু মনে করবেন না, শিরীষবাবু, আমি সব ঠিক করে দেব। কল-কাঠি তো আমার হাতে। সংসার-খরচের টাকায় টান পড়লে তো সেই আমার কাছে এসেই হাত পাততে হবে—তখন দেখে নেব, আপনি কিছু ভাববেন না—

তা ভাববার লোক নয়, শিরীষবাবু। শিরীষবাবু কলকাতার বুকের ওপর বসে দিল্লী মাদ্রাজ বোম্বাইতে ব্যবসা চালাচ্ছে। এখানকার 'ইন্টারন্যাশন্যাল গ্লাস ফ্যাক্টরি'র গেলাসে মদ ঢেলে দিল্লীর গুজরাটি ব্যবসাদার তামাম দুনিয়াকে মাতাল করে দেবার মতলব আঁটছে। সেই শিরীষবাবু বাঙালী-সন্তান হলে কী হবে, মিছিমিছি ভাবনা করে রাতের ঘুম নষ্ট করবার মানুষ নন। গোস্বামীকে একটু টিপে দিলেই হলো। সে ঠিক তার কাজ করে যাবে।

সেদিন আবার সিনেমা থেকে বেরিয়েছে সুসী। ঘন্টায় দশ টাকা কড়ারে যে-মেয়েরা কলকাতা শহরে ভাড়া খাটে তারা আর যা-ই হোক অত সস্তা আদরে ভোলে না।

সেদিন একজন পাঞ্জাবী ছেলে জুটিয়ে দিয়েছিল বেণুদি। চেহারা দেখে সুসীরা বুঝতে পারে কা'র টাকা আছে, আর কা'র টাকা নেই।

বেণুদি বলে দিয়েছিল—বেশি বেয়াড়াপনা করিস নে যেন মা। ছেলেটা নতুন এসেছে এ-লাইনে, এখনই যদি চার গুলিয়ে দিস তো আর কখনও তোর পুকুরে ছিপ ফেলবে না।

সুসী বলেছিল—কী করবো তুমি বলে দাও—

বেণুদি বলেছিল—আমি আবার কী বলবো মা, তোমার বয়েস হয়েছে তুমি জানো না পুরুষ মানুষ কীসে বশ হয়?

সুসী বলেছিল—কিন্তু তুমি তো জানো বেণুদি, আমি কারো সঙ্গে শুই না—

—তা শুতে তোকে কে বলছে বাছা? পুরুষ মানুষ একটু আদর খাতির চায়। পয়সা খরচ করবে, তার বদলে একটু শুকনো খাতিরও করবি নে?

সুসী জিজ্ঞেস করেছিল—কী করতে হবে বলে দাও না তুমি?

বেণুদি বলেছিল—পারিনে বাপু তোর সঙ্গে তক্ক করতে, এ ধারাপাত নাকি যে শিখিয়ে পড়িয়ে মুখস্ত করিয়ে ছেড়ে দেব? ছোকরার নিজের গাড়ি আছে, গাড়ি করে যদি লেকের ধারে কি গঙ্গার ধারে নিয়েই যায় তো যাবি, তখন যেন দোনা-মোনা করিস নে। অন্ধকার দেখে পার্কিং করে দু'জনে বসে বসে গল্প করবি, একটু গা-ঘেঁষে বসবি, এই আর কী। এটুকুও পারবি নে? নইলে তোর জমি-বাড়ি হবে কী করে?

তা সেই প্রস্তাবেই শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিল সুসী। বেশ সুশ্রী স্বাস্থ্যবান ছেলে সন্তোখ অ'রারা। পাঞ্জাবী সন্তান। চন্ডীগড়ে লেখাপড়া শিখেছে। কলকাতায় এসেছে বাবার মটর-পার্টস্-এর দোকান দেখা-শোনা করতে। মাসে হাজার-হাজার টাকার কারবার। সন্তোখ অরোরা ইচ্ছে করলে সুসীর সারাজীবনের

ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। শুধু ভরণ-পোষণ নয়, আরো অনেক কিছু।—ওই যে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর পাশে এই জমিটা দেখছো, এটা আমাদের। এ-রকম আরো অনেক জমি আছে কলকাতায় ছড়ানো। ইচ্ছে করলে তোমায় দিতে পারি।

—তুমি দিতে পারো?

সন্তোখ অরোরা বললে—তোমার জন্যে সব দিতে পারি মিস! আর কী চাও, বলো?

সুসী একেবারে গলে গিয়েছিল সন্তোখের কথায়। বলেছিল—আর কিছু চাই না, আমি অনেকদিন থেকে টাকা জমাচ্ছি শুধু কলকাতায় একটা বাড়ি করবো বলে।

—বাড়িতে তোমার আর কে আছে?

এ প্রশ্নে প্রথমটায় একটু সন্দেহ হয়েছিল সুসীর। সাধারণত এ-ধরনের কথা জিজ্ঞেস করার নিয়ম নেই এ-লাইনে। কিন্তু এ এত জমির মালিক, একে হঠাৎ চটাতে ইচ্ছে হলো না।

বললে—আমার এক বুড়ি মা আছে, সে অন্ধ, বেশি দিন বাঁচবেও না।

—আর কেউ নেই?

—না।

সামনে বাস আর ট্রাম, মানুষ আর দোকান। গাড়ি আর রিক্‌শা। সবই রাস্তা দিয়ে চলেছে ওই এক উদ্দেশ্য নিয়ে। একটা আশ্রয় চাই, একটা মাথা গোঁজবার পাকাপাকি ঠাঁই। সেটা হয়ে গেলে আর কী চাই! তখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা বিয়ে করবে সুসী। একটা গাড়ি কিনবে, আর এই রকম করে গাড়ি চালিয়ে বেড়াবে দু'জনে। কোথাও কোনও ভাবনা থাকবে না। চলো শাড়ি কিনে আসি, সিনেমা দেখি, হোটেলে ঢুকি। কিংবা কোনওদিন যাই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা হাজারিবাগ কি রাঁচি কি নেতার হাট! তারপর সারা আকাশ আমাদের মুঠোর মধ্যে, সারা জীবন আমাদের পকেটে।

—সত্যি বলো না, এ-জমিটা তোমাদের?

—সত্যি না তো কি মিছে কথা বলছি?

—কত দাম নেবে? একটু সস্তা দরে দিও কিন্তু—

সন্তোখ অরোরা বললে—তোমার কাছে আবার দাম নেব কী?

—যাঃ, তুমি মিছে কথা বলছো আমার সঙ্গে। তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছো—

গাড়ি ঘুরে গিয়ে তখন ডান দিকে অন্ধকারে ঢুকলো।

—আমাকে অমনি-অমনি দিলে তোমার বাবা কিছু বলবে না?

—বাবা?

সন্তোখ অরোরা হেসে উঠলো হো-হো করে। বাবা বেঁচে থাকলে কি এই রকম করে খুশীমত ফুর্তি করতে পারি নাকি? তুমি কি মনে করছো আমার বাবা বেঁচে আছে? এখন সমস্ত প্রপার্টির তো আমিই মালিক! এই জমি, এই বাড়ি, এই বিজনেস সবকিছুর মালিক এখন আমিই। আমি ইচ্ছে করলে সব কিছু এখন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি, আবার রাতারাতি দুনিয়াটাকে কিনে ফেলতে পারি।

সন্তোখ এক হাতে স্টিয়ারিংটা ধরলো। আর একটা হাত বাড়িয়ে সুসীকে ধরলো।

—ডারলিং, মাই সুইট ডারলিং—

সুসী চড়াই পাখীর মত সন্তোখের বুকের ভেতরে লেপ্‌টে রইল। যদি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকা যেত তো ভালো হতো। আরো কাছাকাছি। লাখ লাখ টাকার মালিকের কাছাকাছি থাকা ভাল। তাতে বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাতে মনে হয় কোনও ভয় নেই কোথাও, কোথাও কোনও ভাবনা নেই। লাখ লাখ টাকার একটা উত্তাপ আছে। মাথার ওপরে ছাদ থাকার উত্তাপ, ব্যাঙ্কের পাশ বইতে মোটা টাকা থাকার উত্তাপ, চারপাশে চারটে দেয়াল আর সামনে একটা ছোট্ট বাগান থাকার উত্তাপ। সেই উত্তাপের আরামে ঘুম আসে। যেমন পালকের লেপের ভেতরে আরামে ঘুমিয়ে থাকে টাকাওয়ালা লোকেরা। সেই ঘুমের পরে থেকে ভোরের চা। বিছানার ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে আধা-ঘুমের ঘোরে চা খেতে পাওয়ার বিলাস!

তারপর আরো অন্ধকার হয়ে এল কলকাতা। আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল পৃথিবী। আরো নিচু হয়ে এল আকাশ। আর তারপর লেকের জলের ধারে আরো নির্জন হয়ে এল শহর, আরো নিস্তব্ধ হয়ে এল জীবন, আরো উদ্দাম হয়ে এল যৌবন।

—কে?

হঠাৎ একটা টর্চের আলো এসে পড়লো।

যেন কে একজন এক নিমেষের মধ্যে সুসীকে একেবারে আকাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচের মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। একেবারে আরামের লেপের তলা থেকে বাইরে শীতের ঠাণ্ডা বরফের মধ্যে। কাপড়টা এক মুহূর্তে সামলে নিয়েছে সুসী।

তাড়াতাড়ি সরে এসেছে সন্তোখের কাছ থেকে।

—থানায় যেতে হবে আপনাদের।

সাদা পোশাকপরা একজন পুলিশ ইনসপেক্টর, সঙ্গে একটা কনস্টেবল। একেবারে অন্ধকারের বুক জুড়ে ভুঁইফোড় হয়ে উদয় হয়েছে। সুসী সন্তোখের কানে-কানে ফিস ফিস করে বললে—ওদের কিছু টাকা দিয়ে দাও—

সন্তোখ পাঞ্জাবী বাচ্চা। বেশি ভয় পায়নি কিন্তু। বললে—কেন, আমরা কী করেছি যে ঘুষ দিতে যাবো? কী করেছি আমরা যে আমাদের ধরতে এসেছে?

—চলুন, থানায় চলুন।

সন্তোখ রুখে উঠলো। বললে—কেন, কী করেছি আমরা?

—পাবলিক নুইসেন্স করেছেন, ইমমর‍্যাল ট্রাফিক অ্যাক্টে আমরা অ্যারেস্ট করছি—

—চলুন, থানাতেই যাবো। সন্তোখ বুক ফুলিয়ে আরো রুখে দাঁড়ালো।

সুসীর তখন শুধু কাঁদতে বাকি! বললে—তুমি ওদের পাঁচটা টাকা দিয়ে দাও না, তোমার কাছে কি টাকা নেই?

—কেন টাকা দেব মিছিমিছি? পুলিশ যা বলবে তাই-ই শুনতে হবে নাকি?

সুসী বললে—আমাদের যে থানায় ধরে নিয়ে যাবে। সব যে জানাজানি

হয়ে যাবে—

ততক্ষণে ইনসপেক্টর আর কনস্টেবল গাড়ির ভেতরে উঠে পড়েছে। গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললে—চলুন, গাড়ি স্টার্ট দিন—

গাড়ি চালিয়ে দিলে সন্তোখ। সুসী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না সুরু করে দিয়েছে তখন। সুসীর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার রাত্রির অন্ধকারও যেন কাঁদতে লাগলো। ওগো, তোমরা কেউ কিছু বলছো না কেন? কেউ প্রতিবাদ করছো না কেন? আমি মুখ দেখাবো কেমন করে? সমস্ত পৃথিবী যে জেনে ফেলবে আমি নিজেকে ভাড়া খাটাই! সবাই যে আমার মুখে চুণ-কালি লেপে দেবে! আমার যে সর্বনাশ হবে! ওগো...

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

মিছিলটা তখন আরো এগিয়ে গেছে। যাদবপুর ছাড়িয়ে গড়িয়াহাট। গড়িয়াহাট ছাড়িয়ে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। দু'পাশের বাড়ি থেকে মানুষরা জানলা দিয়ে দেখছে। টা-টা করছে দুপুর। অরবিন্দর বড় জল তেষ্টা পেতে লাগলো। কেলো-ফটিকের দিকে চেয়ে দেখলে অরবিন্দ। কেলো-ফটিকের কিন্তু ক্লান্তি নেই। এমনিতে কেলো-ফটিকরা পাড়ার চায়ের দোকানে বসে দিন-রাত গুলতানি করে। বাইরের রাস্তার মেয়েদের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। আজ আর সে বেকার নয়। আজ একটা কাজের মত কাজ পেয়েছে। কাজ পেয়ে বর্তে গেছে। তাই প্রাণপণে সমানে চেঁচিয়ে চলেছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

সেদিন রাত্রে বাড়িতে পুলিশ দেখে অরবিন্দ যতটা না ভয় পেয়েছিল তার চেয়ে বেশী ভয় পেয়েছিল মা।

মা বললে—তা সুসীকে পুলিশে ধরলে কেন বাছা? কী করেছিল সে? সে মেয়ে তো আমার কোনও দোষ করতে পারে না বাবা—

অরবিন্দর মনে আছে, সেই অত রাত্রে সে পুলিশের সঙ্গে থানায় গিয়েছিল সেদিন। সুসী মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদছিল তখন। বোধহয় লজ্জা হচ্ছিল কাউকে পোড়া মুখ দেখাতে!

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু আমার বোন কী করেছে স্যার?

দারোগা বলেছিল—কী করেছিল আপনার বোনকেই জিজ্ঞেস করুন না, সামনেই তো রয়েছে। ভদ্দরলোকের মেয়েরা আজকাল বেশ্যাদের হার মানিয়ে দিয়েছে মশাই!

অরবিন্দ বলেছিল—কিন্তু আমরা তো কিছুই জানতুম না—

—যখন কোর্টে কেস হবে তখন জানবেন!

—কোর্টে কেস হবে নাকি?

—তা হবে না? আমরা তবে আছি কী করতে? ভদ্দরলোকের ছেলেমেয়েরা লেকে বেড়াতে যায়, আর সেখানে কিনা এই কেলেঙ্কারি! এখন আপনার বোনের জামিনের ব্যবস্থা করুন, নইলে সারা রাত আপনার বোনকে এই থানার হাজতে

ওটকে রাখবো—

তা জামিনের ব্যবস্থা আর কে করবে? সেইজন্যে সেই অত রাত্রে আবার দিলীপদার বাড়িতেই যেতে হলো। দিলীপদা টাকাওয়ালা লোক। খুব বকুনি দিলে খানিক। বললে—আমি তখুনি বলেছিলুম তোর বোনটার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়, তা তখন তুই বুঝিসনি, এখন ঠ্যালা বোঝ!

অরবিন্দ বললে—তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে দিলীপদা,—তুমি আমাকে এবারের মত বাঁচাও—

আর ওদিকে তখন গোস্বামীও গিয়ে হাজির হয়েছে শিরীষবাবুর বাড়িতে।

—কী গোস্বামী, কী খবর?

গোস্বামী এইসব কাজের জন্যেই 'ইন্টারন্যাশন্যাল গ্লাস ফ্যাক্টরি'তে কাজ পেয়েছে। কখন কর্তার কী দরকার পড়ে তার জন্যেই ডেসপ্যাচ সেকশানে চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। যখন কাজ-কর্ম থাকে না গোস্বামীর, তখন বড় মন-মরা হয়ে যায়। কিন্তু যখন শিরীষবাবুর ডাক পড়ে তখন হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। বলে—শম্ভু, এক প্যাকেট সিগ্রেট নিয়ে আয়।

এমনি একদিন একটা কাজ দিয়েছিল শিরীষবাবু।

বলেছিল—গাড়ি নিয়ে একবার এক জায়গায় যেতে পারবি গোস্বামী?

গোস্বামী বলেছিল—কেন যেতে পারবো না স্যার, বলুন কোথায় যেতে হবে?

—হারান নস্কর লেন চিনিস?

—না-চিনলেও চিনে বার করতে দোষ কী?

—সেখানে গিয়ে দেখবি সাত নম্বর বাড়ি থেকে একটা মেয়ে রোজ দুপুরবেলা হাতে বই-খাতা নিয়ে বেরোয়, তার পিছু নিবি—দেখবি কোথায় যায়, কী করে,

—তারপর কী করতে হবে বলুন? তাকে হোটেলে তুলে নিয়ে আসতে হবে?

—দূর গাধা। তাকে ধরিয়ে দিতে হবে।

—তার মানে?

শিরীষবাবু রেগে গিয়েছিল। মনিব রাগ করলে গোস্বামীর বড় মন খারাপ হয়ে যায়।

শিরীষবাবু বললে—তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে হবে। স্ট্র্যান্ড হোটেলে এক-দিন বড় অপমান করে আমাকে কথা শুনিয়েছিল—

এর বেশি বলতে হয়নি শিরীষবাবুকে। তারপর চুপি-চুপি কখন হারান নস্কর লেনে গেছে, কখন সুসীকে দেখেছে, কখন তার পেছনে-পেছনে ঘুরেছে তা কেউই টের পায়নি। তারই মধ্যে এক-একবার খেতে এসেছে হরিতকী বাগান লেনে, নিজের বাড়িতে। দেখেছে, বৌদি ঠিক জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

সুরমা বললে—কী গো ঠাকুরপো, খুব যে ক'দিন ঘোরাঘুরি করছো গাড়ি নিয়ে, অফিসের ব্যাপারে বুঝি?

—হ্যাঁ বৌদি, খুব কাজ—

—হোটেলে নাকি?

—নঃ, এবার হারান নস্কর লেন থেকে আসছি, সেখান থেকে ভবানীপুরে

বেলতলা রোড, সেখান থেকে থানায়—

—থানায়? পুলিশের থানায়? থানাতেও তোমার কাজ থাকে নাকি?

গোস্বামীর অত কথা বলবার সময় ছিল না সে-ক'দিন। বাড়িতে আসতো একটু খেতে, আবার তখুনি বেরিয়ে যেত। তারপরেই পাওয়া গেল একটা ছেলেকে। পাঞ্জাবী জাতে। বেশ চটকদার চেহারা। নাম সন্তোখ অরোরা। বেকার মানুষ। তাকেই পাঠানো গেল বেণুদির বাড়িতে। টেলিফোনেই সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। নিজে গাড়ি চালিয়ে যাবে, বলবে, বিরাট টাকার মালিক। বাবা মারা গেছে শুনলে সুসী খুশী হবে। তারপর থানার সঙ্গেও কথাবার্তা বলে রাখা হয়েছে। সিনেমা দেখে যখন বেরোবে দু'জন, তখন গোস্বামী থাকবে পেছনের আর একটা গাড়িতে। পুলিশের দলও তৈরি থাকবে। সন্তোখ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে লেকের ধারে একটা নিরিবিলি কোণে গাড়ি থামাবে। তারপর একটু পরেই পুলিশ গিয়ে হাজির হয়ে গাড়ির মধ্যে টর্চ ফেলবে।

টর্চের আলো দেখেই চমকে উঠে সন্তোখ বলবে—কে?

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গিয়ে অ্যারেস্ট করে দু'জনকে নিয়ে থানায় আসবে। তখন জব্দ!

শিরীষবাবু সব শুনলেন। বললেন—কেউ জামিন দিয়েছে নাকি মেয়েটাকে—?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার!

—কে? কোত্থেকে জামিন পেলে?

—আজ্ঞে; 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র মালিক দিলীপচন্দ্র বেরা মেয়েটার জামিন হয়ে তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।

শিরীষবাবু আর শুনলেন না। বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি যাও এখন—

বলে টেলিফোন তুললেন—কে, দিলীপ?

ওপাশ থেকে দিলীপ বেরা বললে—কে? শিরীষবাবু নাকি?

—হ্যাঁ, বলছিলুম, শেষকালে তুমিই জামিন দিলে?

দিলীপ বললে—দিলুম স্যার, বড় কান্নাকাটি করছিল অরবিন্দ, খুব শিক্ষা হয়ে গেছে ওর, এবারকার মত ওকে ক্ষমা করুন আপনি। আমি সব খুলে বলেছি ওকে, বলেছি তোমার বোনের হালচাল ভাল নয়, একটু সমঝে চলতে বোল এবার থেকে—

—শুনে কী বললে?

দিলীপ বললে—কী আর বলবে ও, ওর বোন তো ওর বশ নয়! আজকাল যে দুনিয়া বদলে গেছে, নইলে আপনার মত লোককে কেউ অপমান করতে পারে?

শিরীষবাবু বললেন—ওকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও তো হে, আমি দু'একটা কথা বলবো ওকে—

দিলীপ বললে—ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, এই তো অরবিন্দ আমার সামনে এখানেই দাঁড়িয়ে আছে, আমি কালই আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলে দিচ্ছি ওকে—

শিরীষবাবু টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু অরবিন্দ স্বপ্নেও ভাবেনি যে সেই শিরীষবাবু পরের দিন অমন করে

অরবিন্দর সঙ্গে কথা বলবেন।

তিনি বললেন—আপনি আসলে কী করেন অরবিন্দবাবু?

একদিন এই অরবিন্দই শিরীষবাবুকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নিজের শোবার ঘরে বসিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। এই শিরীষবাবুই সেদিন মাকে এক কিলো রাবড়ি কিনে নিয়ে গিয়ে দিয়েছিল। সেদিন আর এদিনে অনেক তফাৎ। তখন যেন ছিল প্রায় সমানে সমানে।

মনে আছে, গোপার খুব মন-খারাপ হয়ে গিয়েছিল শিরীষবাবু চলে যাবার পর। রাত্রিবেলা সাত নম্বর থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে আট নম্বরে এসে বালিশে মুখ গুঁজে পড়েছিল অরবিন্দ।

গোপার বোধহয় খুব দুঃখ হয়েছিল অরবিন্দকে দেখে।

বলেছিল—তুমি আমার ওপর রাগ করলে তো?

অরবিন্দর দিক থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে গোপা অরবিন্দর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে জিজ্ঞেস করেছিল—সত্যি বলো না, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?

অরবিন্দ তবু কিছু উত্তর দেয়নি।

গোপা বলেছিল—কিন্তু আমি কী করবো বলো? আমাকে যদি কেউ পছন্দ না করে তো আমার কী অপরাধ? আমার চেহারা ভাল নয় সেও কি আমার দোষ?

তবু অরবিন্দ উত্তর দেয়নি সে-কথার।

—আমার চেয়ে সুন্দরী বউ হলে তোমার আজকে ভাবতে হতো না। তারই দৌলতে তোমার বাড়ি হতো, গাড়ি হতো, সব কিছু হতো! কিন্তু আমি এখন কী করবো তাই বলে দাও। আমাকে যে ভগবান রোগা-রোগা কাঠির মত হাত দিয়েছে, গায়ে মাংস দেয়নি, রং দেয়নি। আমাকে দেখে যে লোকের পছন্দ হয় না। আমি কী করবো, বলো না—

অরবিন্দ তখনও কিছু উত্তর দেয়নি।

গোপা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো তখন। সংসারের কোনও কাজেই যে মেয়ে এল না, যাকে দিয়ে স্বামীর কোনও সাশ্রয়ই হলো না, তার পক্ষে কান্না ছাড়া আর গতি কী? সেই রকম কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগলো—ওগো, তুমি বলো, তুমি বলে দাও, আমার কী দোষ? বলো, কথা বলো, উত্তর দাও—

অরবিন্দ আর থাকতে পারলে না।

হঠাৎ রেগে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে বিছানা থেকে টেনে তুললে—বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে, বেরিয়ে যাও—যাও বেরিয়ে—

সেদিন বড় রাগ হয়ে গিয়েছিল গোপার ওপর। কানের কাছে অমন ঘ্যানোর-ঘ্যানোর করলে যে-কোনও মানুষের মাথায় খুন চেপে যায়। তার ওপর হাতে টাকা নেই ক'দিন ধরে। দু'মাস বাড়ি-ভাড়া দিতে পারেনি। তখন সত্যিই আর জ্ঞান ছিল না। মা'র রাবড়ি জোগাতে হবে, আফিমও জোগাতে হবে, সুসী তো একটা পয়সা উপুড়-হাত করবে না। পুরুষ-মানুষ হয়ে জন্মেছে বলে যেন অরবিন্দই যত দোষ করেছে। তার ওপর শিরীষবাবু একটু আগে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে চলে গেছে।

মাথায় খুন চেপে গেলে যে মানুষ কতদূর নীচ হতে পারে অরবিন্দই সেদিন

তার প্রমাণ দিয়েছিল। সত্যিই সেদিন গোপাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল সে। বলেছিল—যত বলি একটু ঘুমোবো, তা ঘুমোতে দেবে না, কানের কাছে তখন থেকে ঘ্যানোর-ঘ্যানোর করছে—যাও, বেরিয়ে যাও—

আহা! বেচারি সেই অন্ধকার গলির মধ্যে দাঁড়িয়েই চাপা গলায় কেঁদেছিল। গলা ছেড়ে ভালো করেও কাঁদতে পারেনি।

আর অরবিন্দ গোপাকে রাস্তায় বার করে দিয়ে নিজে চোখ-কান-নাক-বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হাজার হোক, অরবিন্দও তো মানুষ। তার সেদিন রাত্রে ঘুম আসেনি। অনেকক্ষণ ঘুমোবার চেষ্টা করেও যখন ঘুম এল না তখন কী-জানি-কী-মনে-করে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দেখে গোপা নেই।

শিরীষবাবু গল্প শুনছিল। বললে—সে কী? নেই? কোথায় গেল?

অরবিন্দ বললে—তা জানি না স্যার, হারান নস্কর লেনের ভেতরটা সব দেখে এলুম, কোথাও পেলুম না তাকে—

—তারপর? শেষ পর্যন্ত কোথায় পেলেন?

অরবিন্দ বললে—পরের দিন সকাল বেলা এল। পাশের বাড়ির লালচাঁদবাবুর স্ত্রীর কাছে রাত্তিরে শুয়েছিল।

—তা তারা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি?

অরবিন্দ বললে—তারা জানে আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে ও-রকম ঝগড়া হয় মাঝে-মাঝে—

শিরীষবাবু সবটুকু মন দিয়ে শুনলেন। তারপর পকেটে যে-ক'টা টাকা তখন ছিল সব বার করলেন। একটা দুটো করে করে দশখানা দশটাকার নোট বার করে অরবিন্দকে দিলেন। বললেন—এই ক'টা রাখুন, পরিবারের সঙ্গে কি ঝগড়া করতে আছে? পরিবার হলো লক্ষ্মী—যান, এই জন্যেই আপনাকে ডেকেছিলুম—

একসঙ্গে এতগুলো টাকা পেয়ে অরবিন্দ যেন অভিভূত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি টেবিলের তলায় মাথা ঢুকিয়ে পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলে।

—আহা হা করেন কী, করেন কী—বলে শিরীষবাবু পা টেনে নিলেন। কিন্তু অরবিন্দ ছাড়লে না।

বললে—তা হোক স্যার, আমাকে আপনি মনে রাখবেন—

শিরীষবাবু বললেন—মনে তো রাখবো, কিন্তু আপনার স্ত্রীকে একটু-একটু মাংস খেতে দেবেন, ঘি খেতে দেবেন, দুধ খেতে দেবেন। টাকাটা সেই জন্যেই দিলাম—

অরবিন্দ বললে—কিন্তু জিনিসপত্তোরের যা দাম বাড়ছে তাতে চাল-ডাল কিনতেই সব ফুরিয়ে যায় স্যার, বাড়তি টাকা থাকে না আর—

—আপনার বোনও তো কলেজে পড়ে? তারও তো খরচ আছে?

—হ্যাঁ, সে খরচও আমাকে জোগাতে হয়। আমি অত টাকা কোত্থেকে পাই বলুন তো?

শিরীষবাবু হঠাৎ বললেন—কিন্তু তার নিজেরও তো রোজগার আছে—

অরবিন্দ কী বলবে বুঝতে পারলে না। থমকে রইল এক মিনিট। তারপর বললে—আপনি যদি আর একবার আমাদের বাড়িতে আসেন তো খুব খুশী হই স্যার, আমার মা আপনার কথা বলছিলেন,—

—মা'র জন্যে রাবড়ি পাচ্ছেন আপনি?

—না।

—তা দিলীপ বেরা আছে কী করতে? রাবড়ি জোগাড় করে দিতে পারে না আপনার মা'র জন্যে? ওর তো দোকান রয়েছে 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'—

অরবিন্দ বললে—আপনি যদি আর একবার অনুগ্রহ করে পায়ের ধুলো দেন, তাহলেই মা খুশী হবে—

—কিন্তু রাবড়ি? রাবড়ি দেয় না কেন দিলীপ?

অরবিন্দ বললে—রাবড়ি তৈরি করা তো আজকাল বে-আইনী ব্যাপার স্যার, কী করে দেবে দিলীপদা?

—কেন, কোন্‌টা আইনী কাজ চলছে? ক'কিলো রাবড়ি চাই আপনার মা'র জন্যে বলুন না। দিলীপ না পারে আমি জোগাড় করে দেব। ছিঃ ছিঃ, এ কী কথা! বুড়ো মানুষ, চোখে দেখতে পান না। একটু আফিম খাবার নেশা আছে, রাবড়ি পাবেন না মানে? তাহলে আমরা রয়েছি কী করতে?...ঠিক আছে, আমি একেবারে রাবড়ি নিয়ে যাবো আপনার বাড়িতে—

—কবে যাবেন, তাহলে বলুন, আমি হাজির থাকবো। সুসীকেও বাড়িতে থাকতে বলবো।

শিরীষবাবু বললেন—সে আমি আপনাকে ঠিক সময়ে আগে থেকে খবর দেব—

সেদিন বাড়িতে এসেই অরবিন্দ সোজা মা'র কাছে চলে গেছে। পায়ের শব্দ পেয়েই মা বলে উঠেছে—কে রে? খোকা এলি?

—মা, এবার তোমার রাবড়ির দুঃখ আমি ঘোচাবোই।

মা বললে—দরকার নেই বাছা আমার রাবড়ি খেয়ে, আপিমও এবার ছেড়ে দেব। চোখই যখন গেল, এখন পোড়া নেশার জন্যে তোকে আর টাকা নষ্ট করতে হবে না।

অরবিন্দ বললে—আমার টাকা নাকি যে আমি নষ্ট করবো। সেই শিরীষবাবু গো, শিরীষবাবুর কথা মনে আছে?

—কে শিরীষবাবু আবার?

—আরে, সেই যে আমার বন্ধু, বিরাট বড়লোক, তিনখানা গাড়ি, সেদিন তোমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে এক কিলো রাবড়ি দিয়ে গিয়েছিল? তোমার মনে নেই? সেই শিরীষবাবুই তুমি রাবড়ি খেতে পাচ্ছো না শুনে হায়-হায় করতে লাগলেন। বললেন—ছি ছি, আপনার মা নেশার রাবড়ি পাচ্ছেন না তা আমাকে বলেননি কেন আপনি? বললেন—কত রাবড়ি আপনার চাই, ক' কিলো?

মা শুনে দুঃখ করলে—আহা রে, বেঁচে থাক বাছা—বেঁচে বর্তে থাক্, আমারও মরণ নেই, আমারও মরণ হয় না...

অরবিন্দ বললে—তোমার কেবল ওই এক কথা, মরা আর মরা। কেন, আমি আছি কী করতে?

মা বললে—আমার কথা আর তোকে অত ভাবতে হবে না, আমার চশমারও দরকার নেই, রাবড়িরও দরকার নেই, তুই বরং সুসীর একটা বিয়ে দিয়ে দে বাবা, ওর বিয়েটা হয়ে গেলে আমি তবু শান্তিতে মরতে পারি—

মা কেবল নিজের কপাল চাপড়ায় আর আফসোস করে।

নিজের ঘরে গিয়ে অরবিন্দ গোপাকে জিজ্ঞেস করলে—সুসী কোথায়?

গোপা বললে—ঠাকুরঝি বেরিয়েছে—

—আবার বেরিয়েছে?

অরবিন্দর রাগ হয়ে গেল। এই সেদিন থানা থেকে খালাস করে নিয়ে এল, আর দু'দিন যেতে না যেতে আবার সেখানে গেছে?—কখন গেল?

গোপা বললে—কখন গেছে তা আমাকে বলে গেছে নাকি যে আমি জানবো! কোনও দিন সে কি আমাকে বলেছে যে আজ আমাকে জিজ্ঞেস করছো?

—তা তোমার মেজাজ এত চড়া কেন? অত চটছো কেন?

গোপা বললে—আমার মেজাজেরই দোষ হয়ে গেল, আমি সারা দিন খেটে মরবো আর মেজাজ একটু চড়লেই দোষ! কেন, তোমার বোনকে তো কিছু বলতে পারো না? তোমাকে বিয়ে করে আমি যত দোষ করেছি, না? আমি আর পারবো না ভাত রাঁধতে, এই তোমাকে আমি বলে রাখছি। আমি এই ভূতের সংসার দেখতে আর পারবো না। সে নাগর নিয়ে লেকের ভেতর অন্ধকারে লীলে খেলা করবে আর আমি তার জন্যে সাত-সকালে উঠে ভাত রাঁধতে বসবো, না? আমি পারবো না অত! এই আমি তোমাকে বলে রাখছি, আমি অত পারবো না।

অরবিন্দরও মাথায় রক্ত চড়ে উঠলো। বললে—পারবে না মানে?

—পারবো না মানে পারবো না।

অরবিন্দ হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো। বললে—হ্যাঁ, পারতে হবে।

—না, পারবো না।

—আবার!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার বলবো পারবো না, পারবো না...

দড়াম করে একটা চড় পড়লো গিয়ে গোপার গালে; আর গোপার মুখে একটা অস্ফুট 'মা গো' শব্দ বেরিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একটা চিৎকার এল—ওরে ও খোকা, কী হলো? কাকে বকছিসরে, কাকে কী বলছিস, খোকা ও খোকা...

অরবিন্দ তখন নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হারান নস্কর লেন পেরিয়ে সদর-রাস্তার ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে বেঁচেছে।

জুডি হবসনের আনকেল বেঙ্গল গভর্নরের মিলিটারি সেক্রেটারির আমল থেকেই কলকাতার সমাজে ঘুণ ধরেছিল। শুধু মানুষের সমাজেই নয়, গোটা দেশটাতেই ঘুণ ধরেছিল। সেই থেকেই সুরু হয়েছিল ভেজাল। চালে ভেজাল ডালে ভেজাল থেকে সুরু করে ভেজাল একেবারে মনুষ্যত্বের মেরুদণ্ডে গিয়ে ঠেকেছিল।

সেদিন সকাল থেকেই আর সুসীকে বাড়িতে পাওয়া গেল না।

মা বললে—হ্যাঁ রে খোকা, সুসী কোথায় গেল? এখনও ঘুমোচ্ছে নাকি?

কিন্তু না, অরবিন্দও দেখে এল বিছানা। গোপাও দেখে এল। কোথাও নেই। জিনিসপত্র সবই রয়েছে। তাহলে পালালো নাকি সে? জামিনের আসামী কি শেষ পর্যন্ত উধাও হয়ে গেল? তাহলে জামিনদার হয়েছে

দিলীপদা, দিলীপদা কী বলবে? দিলীপদা যে নিজে থানায় গিয়ে জামিন দিয়ে তাকে খালাস করে নিয়ে এসেছে?

মা বললে—গেল কোথায় সে?

অরবিন্দর মাথা তখন বিগড়ে গেছে। আগের দিন বউকে মেরেছে। মেজাজ বিগড়ে ছিল, তার ওপর এই কাণ্ড।

সকাল হলো। উনুনে আঁচ পড়লো। অরবিন্দ নিজেই চা করে নিয়েছে নিজের। মা'কে দিয়েছে। অন্যদিন এ-সময়ে অরবিন্দ সংসারের কিছু কাজ-কর্ম করে। বউকে রেহাই দেবার জন্যে উঠোনটা ঝাঁট দেয়, চৌবাচ্চাটা ঝ্যাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে, বাসি কাপড়গুলো কাচে। নিজের জামা-কাপড়ে সাবান দেয়। তারপর সেগুলো রোদে শুকোতে দেয়। রোদে শুকোবার পর পাট-পাট করে ইস্ত্রী করতে বসে। সেই করতে করতেই এগারোটা-বারোটা বেজে যায়। তারপর বাজারের থলিটা নিয়ে সেই অত বেলায় বাজারে যায়।

অত বেলায় বাজার তখন ফাঁকা হয়ে এসেছে। কিন্তু তখন দর একটু কমে। ঝড়তি-পড়তি জিনিস একটু দর-দস্তুর করে নিতে পারলে সুবিধের দরে সওদা হয়। যারা ব্যাপারি, তাদের তখন চলে যাবার তাড়া।

আধ কিলো ঝিঙে, কি এক কিলো পটল দিয়েই থলি ভর্তি হয়ে যায়। বাজারের থলি নিয়ে গিয়ে হাজির হয় দিলীপদা'র ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে।

কিন্তু সেদিন আর কোনও কাজেই মন বসলো না।

মা বললে—কই রে খোকা, কোথায় গেলি? করছিস কী তুই?

কারো শব্দ নেই।

—ও খোকা, খোকা, বৌমা অ বৌমা—কোথায় গেল সব—

বলতে বলতে মা নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। অন্ধকার যেন আরো গাঢ় হয়ে নেমে এল বুড়ীর চোখে। সকাল বেলাই সারা বাড়ি এমন করে অন্ধকার হয়ে যায় না বুড়ীর চোখে। চলতে চলতে একটা কীসে ধাক্কা লেগে আছাড় খেয়ে পড়লো।

—মা গো—

একটা আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর দিয়ে সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে এল। কেউ দেখতে পেলে না, কেউ শুনতে পেলে না, কেউ প্রতিকার করতেও এলো না। একদিন সধবা থাকার সময় এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল অরবিন্দর বাবা। তখন চোখ ছিল, সামর্থ্য ছিল, তখন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ছেলেমেয়ে দু'জনকে মানুষ করেছে। নিজের হাতে রান্না, নিজের হাতে সংসার, নিজের হাতে টাকা। তারপর একদিন অরবিন্দর বাবা মারা গেছে। অরবিন্দ তখন ছোট, সুসী আরো ছোট। সেই ছোট দুটো ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভেবেছিল ছেলে রয়েছে, সে-ই সব দেখবে। সে-ই আবার সংসার গড়ে তুলবে। কিন্তু কোথায় গেল কী! তখন থেকে চোখ যেতে আরম্ভ করেছে। ছেলে-মেয়ে দু'জনেই বড় হয়েছে। বিয়ে দিয়েছে অরবিন্দর। এক একটা চাকরি নিয়েছে ছেলে, আর চাকরি তার গেছে। প্রত্যেক-বার ভয় পেয়েছে মা। কিন্তু আবার কোত্থেকে একটা চাকরি জোগাড় করে নিয়েছে। কিন্তু তারপর? একদিন আর আপিস যায়নি। কিন্তু কোত্থেকে এই

সংসার চলছে তাও মা জানে না। এক-একদিন কে কোত্থেকে এসে এক হাঁড়ি রাবড়ি দিয়ে যায়। কোত্থেকে কে একদিন এসে বুড়ীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। কাউকেও চিনতে পারে না মা। কাউকেই জিজ্ঞেস করে না কোত্থেকে কেমন করে এই সংসার চলছে। কিংবা এই সংসার চলছে কিনা তা জানবার কৌতূহলও যেন ফুরিয়ে গেছে মা'র।

—দিলীপদা ?

—কী রে, তুই এত সকালে ?

অরবিন্দর মুখের চেহারা দেখেই দিলীপ বেরার কেমন ভয় লেগেছিল। এত সকালে তো কখনও আসে না অরবিন্দ। যখনই আসে, ধোপ-দুরস্ত দাড়ি-কামানো চেহারাখানা জ্বল-জ্বল করে।

—আজকে রেস খেলতে যাবে না দিলীপদা ?

—রেস ? কেন ? তুই রেস খেলবি নাকি ?

অরবিন্দ বললে—না, রেস খেলবো না আমি। শুধু তোমার সঙ্গে রেস খেলা দেখতে যাবো।

—তা সে এখন কী ? সে তো দুপুরে।

—তা হোক, এখন থেকেই আমি বসে থাকবো, তারপর তোমার সঙ্গে মাঠে যাবো।

দিলীপদা হঠাৎ অবাক হয়ে গেল অরবিন্দর কাণ্ড দেখে। বললে—কী হয়েছে তোর বল তো ? তোর বউ-এর অসুখ ? মা'র বাতের ব্যথা বেড়েছে ? কিছু টাকা দরকার ?

অরবিন্দ বললে—না—

—তাহলে কী হয়েছে তোর, বল তো ?

অরবিন্দ বললে—রেস খেলার পর তুমি তো বারে যাবে ?

—যদি যাই তো তোর কী ?

অরবিন্দ বললে—আমাকে আজকে একটু মদ খাওয়াবে দিলীপদা ? আমার আজকে খুব মদ খেতে ইচ্ছে করছে—

দিলীপদা সোজা হয়ে বসলো এবার। বললে—কেন, তোর কী হয়েছে বল দিকিনি ?

—খুব মদ খেতে ইচ্ছে করছে দিলীপদা, আমাকে আজকে একটু মদ খাওয়াবে ? টাকা থাকলে আমি নিজেই অবশ্য কিনে খেতুম। কিন্তু মদের দাম যে খুব। মদ খেয়ে আমার একেবারে বুঁদ হয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। এমন বুঁদ হয়ে থাকবো যেন আর কখনও নেশা না কাটে। যেন সমস্ত দিনরাত সেই নেশার ঘোরে একেবারে সব ভুলে থাকি—

দিলীপদা ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—ন্যাকামি রাখ, কী হয়েছে তোর, সত্যি করে বল তো ?

অরবিন্দ বললে—সুসী পালিয়ে গেছে—

—পালিয়ে গেছে মানে? বলছিস কী তুই? আমি যে তাকে থানা থেকে জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম!

—তা আমি কী করবো? তুমি ছাড়িয়ে নিয়ে এলে কেন? কেন তুমি জামিন দিলে দিলীপদা? তুমি তাকে কেন আটকে রাখতে বললে না? কেন তুমি তার ফাঁসি দিলে না? এখন কী করবে তাই বলো? আমি থানায় যাবো? আমি থানায় গিয়ে ইনসপেক্টারকে বলবো যে আমার বোন পালিয়ে গেছে? বলবো যে তার বদলে আমাকে ধরে রাখো, আমাকে জেলে পোর? আমাকে ফাঁসি দিতে বলবো?

দিলীপদা খানিকক্ষণ অরবিন্দর দিকে চেয়ে দেখলে।

তারপর বললে—তুই চা খেয়েছিস?

অরবিন্দ বললে—চা খাবো কি? ঘুম থেকে উঠেই সোজা চলে এসেছি তোমার কাছে। বউটাকেও কাল খুব মেরেছি, জানো? বেচারি আমার মুখের ওপর কথা বলেছিল। খুব মেরেছি, এমন মেরেছি যে গালে কালশিটে পড়ে গেছে।

—নে, চা খা।

সামনে চায়ের কাপ এগিয়ে দিলে দিলীপদা। অরবিন্দ গোগ্রাসে চা গিলতে লাগলো। বললে—আমি তো চা খাচ্ছি, কিন্তু গোপা যে কী খাচ্ছে তা ভগবান জানে—

—বাজারের থলি রয়েছে যে হাতে, বাজার করবি?

——ওটা অভ্যেস দিলীপদা! বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ওটা নিয়ে বেরোই—

—তাহলে, এই নে টাকা নে, যা, ভাল আনাজ-পত্তোর কিনে নিয়ে বাড়ি যা, খেতে তো হবে, না কী? তোকে আরো বেশি টাকা দিতে পারতুম, কিন্তু শালা আমার কারবারেই যে হাত পড়েছে—যা, তুই যা—দেরি করিসনে—

—কিন্তু মদ?

দিলীপদা ধমকে উঠলো আবার—খাওয়াবো, খাওয়াবো তোকে। আগে বাড়িতে বাজার করে নিয়ে যা তো, তারপর দেখা যাবে!

অরবিন্দ উঠলো এবার। বললে—তুমি ছিলে দিলীপদা, তাই তবু বেঁচে আছি, কিন্তু আর পারছি না। আচ্ছা দিলীপদা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি, এরকম করে আর কদ্দিন চলবে?

—তো চাকরি-বাকরি কিছু করলি না, একটা ব্যবসা পর্যন্ত ধরলি না, তো সেটা কার দোষ? আমার?

অরবিন্দ বললে—তুমি সব জেনেও ও-কথা বলছো দিলীপদা? তোমার বন্ধু শিরীষবাবু ইচ্ছে করলে একটা চাকরি করে দিতে পারতো না আমাকে? শুধু শিরীষবাবু কেন, তোমার তো অনেক বন্ধু আছে, কেউ আমাকে চাকরি করে দিতে পারতো না? সকলেই কি আমার বোনকে চাইবে? আমার যদি বোন না থাকতো, তাহলে কি কেউ আমার মা'কে রাবড়ি কিনে দিত না? আমার বোন না থাকলে কি আমি উপোস করে মরতুম? এই যে সুসী আমাদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল, এরপর কি কেউ আমার বাড়ি আসবে না?

তারপর একটু দম নিয়ে বললে—আর ব্যবসার কথা যে বলছো, ব্যবসা কি

আমি করিনি? ইনসিওরেন্সের দালালি করেছি, গেঞ্জির দোকান করেছি, ভদ্দর-লোকের ছেলে হলে যা যা করা সম্ভব নয় তাও করেছি, কিন্তু সবটাই কি আমার দোষ? ব্যবসা যে চললো না সেও কি আমার দোষ দিলীপদা? সবাই যে ধারে মাল নিয়ে শোধ দিলে না, তার জন্যেও কি আমি দায়ী?

—তা পৃথিবীর সব লোক তো করে খাচ্ছে, তুই-ই বা কেন কিছু করতে পারছিস না?

অরবিন্দ কথাটা শুনে খানিকক্ষণ থমকে রইল। তারপর বললে—তুমিও ওই কথা বলছো দিলীপদা? সব লোকের কথা যে বলছো, তুমি জানো না ওই চায়ের দোকানে বসে কত লেখা-পড়া জানা বেকার ছেলে দিন-রাত শুধু চা খাচ্ছে আর বিড়ি ফুঁকছে? তারাও কি আমার মত নয়? তাদের কথা কে ভাবে বল দিকিনি?

দিলীপদা বললে—তুই কমিউনিস্টদের মত কথা বলছিস দেখতে পাচ্ছি—

—দাদা, ওই জন্যেই তো বলছিলাম, আমাকে একদিন পেট ভরে মদ খাইয়ে দাও, এমন করে খাইয়ে দাও যাতে সব ভুলে যেতে পারি, সংসার, বউ, বোন, মা সকলের কথা ভুলে একেবারে বেহেড্ হয়ে থাকি—

দিলীপদা এবার অরবিন্দকে ঠেলে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। বললে—যা, বাড়ি যা,—

—কিন্তু তুমি তো কিছু ভরসা দিলে না দিলীপদা?

—কীসের ভরসা দেব আমি?

—ওই যে বললাম, বোন চলে গেলে আমি খাবো কী?

দিলীপদা অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন, বোন কি তোকে রোজগার করে খাওয়াতো?

—না, তা নয়, কিন্তু আমি তো ওই বোনকে দেখিয়েই রোজগার করতুম।

দিলীপদা বললে—ও, তাহলে ওই জন্যেই তোর দুঃখু। বোন চলে গেছে বলে নয়, বোন চলে গেলে কাকে ভাঙিয়ে রোজগার করবি, সেই জন্যে?

অরবিন্দ বললে—তুমি তো সব জানো দিলীপদা, তোমার কাছে তো কিছু লুকোন নেই। আমার বউকে যদি ভালো দেখতে হতো তো আমার আজ ভাবনা!

—তুই যা দিকিনি, তুই যা—আর বাজে বকিসনে।

বলে জোর করে অরবিন্দকে ঠেলে বাইরে বার করে দিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে দিলে দিলীপ বেরা। তারপরে আবার হিসেবের খাতা নিয়ে বসলো। হিসেবটা দিলীপ বেরা বাড়িতে বসেই করে। হিসেবের অনেক রকম কারচুপি করতে হয় তাকে। দুটো তিনটে খাতা রাখতে হয়। ওটা নিজে না করলে হয় না। আজকাল অন্য কারোর ওপর হিসেবের ভার দেওয়া বিপদ। দিনকাল বড় খারাপ! দিলীপ বেরা নিজের মনে মনেই একবার উচ্চারণ করলে—সত্যিই দিন-কাল বড় খারাপ।

তারপর ইণ্ডিয়ার ফাইন্যান্স মিনিস্টার মোরারজী দেশাই সাহেব গিয়ে হাজির হলো আমেরিকার হোয়াইট-হাউসে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার-এর সঙ্গে পরামর্শ হলো অনেকক্ষণ!

—ক্যালকাটা? কিন্তু পি-এল-ফোর এইট্টির কোটি-ক্রোটি টাকা যদি ক্যালকাটার ওপর খরচ করা হয়, তাহলে যে ইনফ্লেশান হবে ইওর একসেলেন্সি? বাঙলা দেশে যে টাকার বন্যা বয়ে যাবে।

প্রেসিডেন্ট বললে—কিন্তু ক্যালকাটা যে বর্ডার-স্টেট! পাশেই চায়না, সেখান থেকে যে সব দেশটা রেজিমেন্টেশন হয়ে যাবে। ক্যালকাটা যতদিন আন-হেল্‌দি থাকবে, ক্যালকাটা যতদিন গরীব থাকবে, ক্যালকাটা যতদিন অসন্তুষ্ট থাকবে, ততদিন যে সে-সুযোগ নেবে চায়না?

ওদিকে হোয়াইট-হাউসে বসে এই শলা-পরামর্শ চলতে লাগলো। এ সেই আইসেনহাওয়ারের যুগের পরামর্শ। আর এদিকে বাংলায় তখন চিফ-মিনিস্টার ডাক্তার বি সি রায়। কেউ জানলো না, কোথায় কোন্ ফাইল খোলা হলো ক্যালকাটাকে কেন্দ্র করে। সাউথ-ইস্ট-এশিয়ার ফাঁক ভরাট করার জন্যে কী প্ল্যান তৈরি হলো কোন্ চক্রান্তে। কলকাতায় তখন অরবিন্দরা এক কিলো মাংস কেনবার জন্যে দিলীপদাদের দরজায় ধর্না দিতে লাগলো। সুসীরা কল-গার্ল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো বেণুদির আস্তানায়। শিরীষবাবুরা গোস্বামীদের দিয়ে 'কিপলেক্স' প্লাসের 'ইমপোর্ট লাইসেন্স'-এর তদবির করতে লাগলো। আর জুডি আর ক্লারা হবসন এখানে এসে ইণ্ডিপেনডেন্ট ইণ্ডিয়ার ছবি দেখতে লাগলো স্ট্র্যান্ড-হোটেলের আর্কেডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর সে ছবি আমেরিকায় তৈরি ক্যামেরা দিয়ে তুলে নিতে লাগলো চড়া দামে ইয়োরোপের কাগজে বিক্রি করবে বলে। আর বুধবারিরা আসতে লাগলো পাঁঠা কাঁধে করে কালিঘাটের মন্দিরে পুজো দিতে।

—জায়, কালী মাঈকী জায়।

আর তখন নর্থ আর সাউথ থেকে মিছিল আসতে লাগলো রাজভবন লক্ষ্য করে। তারা চিৎকার করতে লাগলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

তারা এক সঙ্গে শ্লোগান দিতে লাগলো—

মজুতদারের শাস্তি চাই
সস্তাদরে খাদ্য চাই।
মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও।
নইলে গদী ছেড়ে দাও।

প্রোসেসানের চাপে রাস্তার ট্রাম-বাস আটকে গেছে। সামনে যাবার পথ বন্ধ। রাস্তা জুড়ে নর্থের দিক থেকে প্রোসেসান আসছে। এক মাইল লম্বা গাড়ির সার। রিক্‌শা বাস ট্রাম সাইকেল সমস্ত কিছু।

—দু'দিন ট্রামে চড়ে নিন মশাই, এরপর ট্রাম-বাস কিচ্ছু চলবে না, তখন বুঝবেন ঠ্যালা।

ট্রামের আর বাসের লোকজন যেন ট্রামে-বাসে চড়ে মহা অপরাধ করেছে, এমনি-

ভাবে চেয়ে দেখতে লাগলো মিছিলের মানুষের দিকে। ওরাই শরীর পাত করে যেন দেশ-উদ্ধার করতে নেমেছে, আর আমরা ট্রামে চড়ে আরাম করে যেন দেশদ্রোহিতা করছি।

—নেমে আসুন মশাই, আমাদের সঙ্গে হেঁটে চলুন, দেশ আমাদের একলার নয়। এ আপনাদেরও মাতৃভূমি।

আবার উপদেশও ছড়ায়! যারা হাঁটে, গাড়ি-চড়া লোকদের দিকে চেয়ে চেয়ে তারা উপদেশামৃত বর্ষণ করে।

ট্রামে এক বুড়ো ভদ্রলোক পাশের লোককে জিজ্ঞেস করলেন—কীসের প্রোসেসান মশাই?

—আর কীসের মশাই, লাল-ঝাণ্ডাদের। ওদের জ্বালায় কাজ-কর্ম কি আর কিছু করা যাবে?

ওদিক থেকে কে একজন বলে উঠলো—মশাই, দেখবেন যদি কোনওদিন দেশের মুক্তি হয় তো ওদের দ্বারাই মুক্তি হবে। আপনার-আমার দ্বারা হবে না—

আলোচনাটা অন্য দিকে মোড় ঘুরছে দেখে এদিককার লোকরা চুপ করে গেল। বেশি তর্ক করলেই ট্রামের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি গালাগালি সুরু হয়ে যাবে। নিরঞ্জনের এতক্ষণ এসব খেয়াল ছিল না। গোবরডাঙ্গা থেকে শ্যাম-বাজারে নেমে ট্রামটা ধরেছিল। ট্রামে উঠেই নোটখাতাগুলো খুলে বসেছিল। পহ্লবদের আমলের কয়েকটা ভাষার নমুনা জোগাড় করেছিল পুরোন পুঁথি থেকে। একবার যদি প্রমাণ করা যায় যে, ওগুলো বাঙলা বিভক্তি-সন্ধি আর ধাতুরূপের সঙ্গে মেলে, তাহলেই কার্যসিদ্ধি। জীবনে অনেকদিন ধবে নিরঞ্জন পণ্ডিত সমাজে খাতির পাবার জন্যে চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু করে গোবরডাঙ্গা কলেজে চাকরি, কে জানবে তাকে? একটা ডক্টরেট পর্যন্ত পেলে না এতদিনে।

হঠাৎ খেয়াল হলো যে ট্রামটা চলছে না। মাথা তুলে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে।

—কী হয়েছে মশাই ওদিকে?

কে আর তখন উত্তর দেবে তার কথার! সবাই তখন ওই একই প্রশ্নের আঘাতে বিব্রত। নিরঞ্জন ভালো করে চেয়ে দেখলে সামনে প্রোসেসান চলছে। বুঝতে পারলে ট্রাম চলতে দেরি হবে। হঠাৎ বলা-নেই-কওয়া-নেই সেখানেই নিরঞ্জন নেমে পড়লো। তারপর কাঁধের চাদরটা সামলে নিয়ে একটা গলির ভেতরে ঢুকে পড়লো। রাস্তাটা জানা ছিল নিরঞ্জনের। অনেকদিন আসতে হয়েছে এ-রাস্তায়।

তারপর একটা বাড়ির সামনে এসে সদর দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো।

—পঞ্চাননবাবু বাড়ি আছেন?

পঞ্চাননবাবু সাধারণত সমস্ত দিন বাড়িতেই থাকেন। প্রায় আশী বছর বয়েস বৃদ্ধের। পূর্বপুরুষরা বরাবর আফগানিস্থানে কাটিয়েছে চাকরি-সূত্রে। ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট যখন আফ্রিদিদের সঙ্গে মারামারি করেছে, তখন তাঁর আদি-পুরুষ সেই ব্রিটিশ-গভর্নমেন্টের ক্যানটনমেন্টে চাকরি করতো। তারপর ছেলে-নাতি সবাই সেই অফিসেই চাকরি করেছে। কেউ ছোট চাকরি, কেউ আবার বড়। পঞ্চাননবাবু নিজেও সেখানে বিয়াল্লিশ বছর চাকরি করে রিটায়ার করেছেন। সেখানে থাকার সময়ই আফ্রিদিদের একটা মসজিদের ভেতর এই পাণ্ডুলিপিটা

পান। আসবার সময় সেটা সঙ্গে করে এনেছেন। খবরটা এক বন্ধুর কাছেই পেয়েছিল নিরঞ্জন। তারপর থেকেই নিরঞ্জনের মাথায় ঢুকেছে যে ওটা আদি বাঙলা ভাষা!

ছোট একটা ছেলে নিরঞ্জনকে নিয়ে একেবারে ভেতরে দাদুর কাছে নিয়ে গেল।

পঞ্চাননবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী ঠিক করলেন মশাই?

নিরঞ্জন বললে—দেখুন, এখনও টাকাটা জোগাড় করতে পারিনি, আমি ওটা কিনবোই, ঠিক করেছি—

পঞ্চাননবাবু বললেন—কিন্তু আর বেশি দেরি করবেন না—আরো দু'একজন খদ্দের আছে কিনা—

—কিন্তু আপনি আমাকে কথা দিয়ে রেখেছেন পঞ্চাননবাবু, আপনার কথার ভরসাতেই আমি টাকার জোগাড় দেখছি—

পঞ্চাননবাবু বৃদ্ধ মানুষ। ভোগের বয়েস তাঁর পেরিয়ে গেছে। তবু ভোগের বোধহয় কোনও বাঁধাধরা কাল-অকাল নেই। বললেন—আমি আর ক'দিন আছি মশাই, আমি মারা গেলেই তো নাতি-নাতনিরা এটা নষ্ট করে ফেলবে, তাই যাবার আগে সব বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে চাই—তা সামান্য পাঁচশো টাকাও আপনি জোগাড় করতে পারছেন না?

নিরঞ্জন বললে—পারলে তো আর আপনাকে বলতে হতো না, নিয়েই যেতাম। চেষ্টা করছি যাতে বেশি দেরি না হয়—

—তা পাঁচশোটা মাত্র টাকা, তাও জোগাড় করতে পারছেন না? আজকাল তো শুনতে পাই মাস্টারদের অবস্থাই সব চেয়ে ভাল?

নিরঞ্জন বললে—কে বললে আপনাকে?

—বলবে আবার কে? সবাই তো জানে। আমার নাতিরই তো দু'জন মাস্টার, দু'জনে মাসে দু'শো টাকা মাইনে নেয়। টিউশানি করলে তো মাসে ছ'টা টিউশানি করা যায়!

—আপনি যে কী বলেন পঞ্চাননবাবু, ছ'টা টিউশানি কখনও করা যায় মাসে?

—কেন? করা যাবে না কেন?

নিরঞ্জন বললে—রাত্রে তো মাত্র তিন ঘন্টা টাইম, সাতটা থেকে ন'টা, সপ্তাহে দু'দিন পড়ালেও মাসে তিনটে টিউশানির বেশি তো করা যায় না—

—সে কি মশাই? সবদিন যে পড়াতে হবে, তার কী মানে আছে? না পড়ালেই হলো! অ্যাবসেন্ট হলেই হলো! এই তো আমার নাতির মাস্টাররা, তারা তো মাসে পাঁচ-ছ'দিন আসেই না। তারপর নোট? আপনি নোটবই লেখেন না?

নিরঞ্জন অপমানগুলো সব সহ্য করছিল মুখ বুঁজে। সহ্য করা ছাড়া গতি নেই।

বললে—না—

—নোটবই যদি না লেখেন তো 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' লেখেননি?

নিরঞ্জন বললে—না।

—সে কী মশাই, আপনি তো মাস্টারি-লাইনের কলঙ্ক মশাই, বাঙলা সাহিত্যের মাস্টারি করছেন আর 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' লেখেননি? কেন, লেখেননি কেন? কে আপনাকে লিখতে বারণ করেছে?

—না, কেউই বারণ করেনি, এমনিই লিখিনি!

পঞ্চাননবাবু বললেন—লিখলেই পারতেন, সবাই-ই লিখছে আর আপনিই বা কেন বাকি রইলেন। সাপ ব্যাং আপনারা যা লিখবেন তা তো আমাদের নাতি-নাতনীদের কিনতেই হতো! আর আপনারও পকেটে দুটো ফালতু টাকা আসতো। তাহলে আর পাঁচশো টাকার জন্যে আপনাকে হা-পিত্যেশ করতে হতো না—

নিরঞ্জন সেই কোন্ সকালে দু'টি ঝোল-ভাত খেয়ে কলেজে গিয়েছে, আর এখন ফিরছে। অত কথা বলার ধৈর্য ছিল না। শুধু বললে—আমি চেষ্টা করছি টাকাটার জন্যে, দেখি, আর দু'একদিনের মধ্যে জোগাড় করতে পারবো বোধহয়। আপনি আর কিছুদিন ধরে রাখুন—

বলে আর বসলো না। চাদরটা কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সোজা আবার রাস্তায় নেমে এল। বাইরে তখনও মিছিলের জের চলছে। ট্রাম-বাসগুলো আস্তে-আস্তে চলেছে। নিরঞ্জন একবার ভাবলে বাসে উঠবে। কিন্তু উঠবেই বা কী করে? সবাই ঝুলছে হ্যাণ্ডেল ধরে। তার চেয়ে বাকি রাস্তাটুকু হেঁটে যাওয়াই ভালো। হাতে ব্যাগ কাঁধে চাদর নিয়ে উঠতে চেষ্টা করাও বিপজ্জনক।

নিরঞ্জন একবার মিছিলের লোকগুলোর দিকে চেয়ে দেখলে। লাল-লাল ফেস্টুন কাঁধে করে নিয়ে চলেছে সবাই। হৈ-হৈ করতে করতে চলেছে—

মজুতদারের শাস্তি চাই।
সস্তাদরে খাদ্য চাই।
মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও।
নইলে গদী ছেড়ে দাও।

অথচ কেন যে ওরা অমন করে চেঁচাচ্ছে কে জানে? নিরঞ্জন ভয়ে ভয়ে রাস্তার এক ধারে সরে এল। ধাক্কা দিতে পারে। সরে আসাই ভাল। এমন চেঁচামেচি না করে এরা যদি একটু লেখাপড়া করে তো এগজামিনে ভাল নম্বর পায়। দরকার নেই ও-সব কথা বলে। শুনতে পেলে হয়ত সবাই মিলে নিরঞ্জনকে তেড়ে মারতে আসবে।

বিডন স্ট্রীটের কাছে আসতেই নিরঞ্জন বাঁ দিকে মোড় ঘুরলো। এবার নিরি-বিলি রাস্তা। আর খানিকটা গেলেই হরিতকী বাগান লেন। পাঁচশো টাকা। অনেকদিন আগে সুরমা একজোড়া সোনার বালা গড়িয়েছিল। সে দুটো যদি দিত সুরমা তো পাঁচশো টাকায় বাঁধা রেখে জিনিসটা নিতে পারা যেত। কিন্তু সুরমা তো ওর কদর বুঝবে না। আর কে-ই বা কদর বুঝবে? লেখাপড়ার কদর বোঝ-বার মত লোকই বা কলকাতায় ক'জন আছে! পঞ্চাননবাবু বলে কি না নোটবই লিখতে! বলে কিনা 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' লিখতে! কী যে বলে পঞ্চানন-বাবু! এখন বুঝছে না কেউ। কিন্তু একদিন বুঝবে সবাই। সেদিন সবাই জিজ্ঞেস করবে—কে নিরঞ্জন হালদার? এত দিন নিঃশব্দে বসে বসে রিসার্চ করেছে অথচ আমরা তো কই জানতে পারিনি!

এমনিই হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ওঁদের বেলাতেও তাই ঘটেছে। যখন লোকে টের পেয়েছে তখন হৈ-চৈ করেছে তাঁদের নিয়ে।

বাড়ির সামনে এসে আস্তে আস্তে কড়া নাড়তে লাগলো।

অন্য দিন কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে সুরমার গলার আওয়াজ আসে—যাচ্ছি—

তারপরেই দরজা খুলে দেয় সুরমা। বলে—এত দেরি হলো যে?

আবার কড়া নাড়তে লাগলো।

তবু কোনও উত্তর নেই।

কী হলো? অন্যদিন তো এমন হয় না? ঘুমিয়ে পড়লো নাকি ও?

আবার কড়া নাড়তে লাগলো নিরঞ্জন।

তবু কোনও সাড়া-শব্দ নেই। নিরঞ্জন ঘুরে বাড়িওয়ালার দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলো। সুরমার মাসিমা বললে—ওমা, তুমি? সুরমা তো এখনও আসেনি? তুমি দাঁড়াও বাবা, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি—

মাসিমা আবার ওদিক দিয়ে দরজা খুলে দিয়ে গেল।

নিরঞ্জন বললে—কোথায় গেল সুরমা?

—তা তো জানি না, আমাকে বলে গেল কোথায় এক আত্মীয় আছে, তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে—সন্ধ্যের আগেই আসবে।

—কে আত্মীয়? কোথায় থাকে সে আত্মীয়? সুরমার আত্মীয় তো কেউ কোথাও আছে জানি না?

—কী জানি বাবা, তা তো আমি বলতে পারি নে। দেখলুম সেজেগুজে বেরোল।

—কার সঙ্গে বেরোল? একলা?

—হ্যাঁ, একলাই তো গেল মনে হলো!

একলা বেরোবে সুরমা! নিরঞ্জন বাড়িতে ঢুকেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু ঠিক করতে পারলে না। যে লোক এই ঘরখানার বাইরে কোথাও যায়নি, সে একলা-একলা সেজেগুজে রাস্তায় বেরোবে?

নিরঞ্জন সেই অবস্থাতেই তক্তপোষটার ওপর বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।

তারপর এল সেইদিন। ওয়াশিংটনের হোয়াইট-হাউসে এসে বসলো জন কেনেডি। কাগজপত্র-ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ নজরে পড়লো একখানা ফাইলের ওপর। পি-এল ৪৮০। আফ্রিকা আর সাউথ ইস্ট-এশিয়ার সব জায়গায় চায়না আস্তে আস্তে তখন হাত বাড়াচ্ছে। কিন্তু ক্যালকাটা? ক্যালকাটা তো এখনও কম্যুনিজম-এর হট-বেড হয়ে রয়েছে। ডিপ্লোমেটিক চিঠি গেল দিল্লির এমব্যাসির কাছে। ক্যালকাটার কী অবস্থা লিখে পাঠাও।

ওদিক থেকে রিপোর্ট এল—মিঃ প্রেসিডেন্ট, ক্যালকাটার কোনও উন্নতি হয়নি। ক্যালকাটার মিউনিসিপ্যালিটি সেই যে কোন্ মান্ধাতার আমলে জলের কল বানিয়েছিল সে এখনও সেই রকমই আছে। আগে যেখানে পাঁচ লক্ষ লোক ছিল এখন

সেখানে ষাট লক্ষ লোক হয়েছে। কিন্তু জল বাড়েনি, রাস্তা বড় হয়নি। হাজার-হাজার লোক এখনও রাস্তার ফুটপাতে শুয়ে থাকে। স্কুলে-কলেজে ছেলেদের বসবার জায়গা নেই। নতুন জেনারেশনের ছেলেরা শুধু হরতাল, হল্লা আর স্ট্রাইক করতে জানে। মেয়েরা কল-গার্লের পেশা পছন্দ করে, কিংবা থিয়েটারের দলে নাম লেখায়। ফুড-শর্টেজ, অস্বাস্থ্য, ধোঁয়া, বাসের ভিড়, সব মিলে অরাজক অবস্থা চলছে এখানে; প্রত্যেক কাজের জন্যে এখানে ইনফ্লুয়েন্স, প্রত্যেকটি জিনিসের জন্যে এখানে ঘুষ। ইনফ্লুয়েন্স না করতে পারলে কিংবা ঘুষ না দিলে এখানে কোনও কার্যোদ্ধার হবার আশা নাস্তি। রোজ এখানে স্ট্রাইক চলছে, রোজ এখানে হরতাল, রোজ এখানে অ্যাকসিডেন্ট। এখানকার সব অফিস বোম্বাইতে চলে যাচ্ছে—

ফাইলে সবই লেখা ছিল। ইণ্ডিয়ার ফাইন্যান্স মিনিস্টারের নোটও ছিল তাতে।

কেনেডি সাহেব আবার চিঠি লিখলেন ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টকে। ক্যালকাটার উন্নতি করতেই হবে। তাতে ইনফ্লেশন হোক আর যাই হোক।

কলকাতা থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের চীফ মিনিস্টার ডাঃ বি সি রায় ফাইলখানা বগল-দাবা করে ছুটলেন আমেরিকায়।

আর সেইদিনই ইণ্ডিয়া গভর্মেন্টের ইন্টারন্যাশন্যাল ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স মিনিস্ট্রির কলকাতা অফিস থেকে এক সুট-পরা স্মার্ট ছোকরা এসে হাজির হলো শিরীষবাবুর অফিসে। আগে থেকেই ভূধরবাবু টেলিফোনে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাই কোনও আয়োজনেরই ত্রুটি ছিল না কোথাও।

শিরীষবাবু নমস্কার করলেন। আসুন স্যার, আসুন—আপনার নামই তো মিস্টার এস-কে-বাগচী?

এস-কে-বাগচী নতুন জেনারেশনের বাঙালী। বেশি কথা বলে না। যাতে বেশি কথা না বলতে হয় তার জন্যেই সিগারেট খায় ঘন-ঘন।

বললে—আপনার ফ্যাক্টরিটা দেখবো একবার, দেখে আমাকে ইনসপেকশান রিপোর্ট দিতে হবে—

সেটা অফিস, আর ফ্যাক্টরিটা কলকাতার বাইরে।

শিরীষবাবু বললেন—নিশ্চয়ই দেখবেন, কিন্তু তার আগে চা না কফি কী খাবেন তাই বলুন?

—না না, আমি কিছুই খাবো না। আমি খেয়েই এসেছি—

শিরীষবাবু হেসে বললেন—তা কি হয় স্যার, আপনি হলেন অতিথি, আপনাকে কি না-খাইয়ে ছাড়তে পারি?

এস-কে-বাগচী হেসে বললেন—না না, ও-সব ফর্ম্যালিটি থাক, আগে কাজ—

তা তাই ঠিক হলো। গোস্বামী তৈরিই ছিল। গোস্বামী সেজে-গুজে হাজির। শিরীষবাবু বললেন—আমার এই লোককে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি, এ আপনাকে আমার ফ্যাক্টরি দেখিয়ে দেবে—গাড়িও আপনার জন্যে রেডি রেখেছি—

এস-কে-বাগচি গাড়িতে উঠলো গিয়ে। উঠে পেছনের বিরাট সিটটায় বসলো। গোস্বামী বসলো সামনে ড্রাইভারের পাশে।

পেছন ফিরে বললে—স্যার, যদি অনুমতি দেন তো একটা সিগ্রেট খেতে পারি?

সিগারেট ধরালো গোস্বামী। তারপর আর কথা নয়। একেবারে সোজা ফ্যাক্টরি। শিরীষবাবুর 'ইন্টারন্যাশন্যাল গ্লাস ফ্যাক্টরি'। এমন কিছু একটা ফ্যাক্টরি নয় যে দেখতে হাতি-ঘোড়া সময় লাগবে। বাইরে থেকে দেখেই এস-কে-বাগচি বুঝেছিল। ভেতরে ঢুকলো। তখন কাজ চলছে। কাচের গ্লাস, কাচের ডাক্তারি সরঞ্জাম। তাছাড়া আছে শিশি-বোতল ইত্যাদি। আগে যখন বাজার ছিল বড়, বোম্বাই মাদ্রাজে দিল্লিতে মাল যেত, তখন প্রোডাকশান ছিল বেশি, স্টাফ ছিল বেশি। আয়ও তাই বেশি হতো।

এস-কে-বাগচি চুপ করে সব দেখলে। একটাও কথা বললে না। ঘুরে ঘুরে শুধু একটার পর একটা সিগারেট খেতে লাগলো। তারপর বললে—চলুন এবার—

গোস্বামী বললে—আর কিছু দেখবেন না স্যার?

—না!

গাড়ি যখন ফিরে এল, তখন শিরীষবাবুর অফিসে এস-কে-বাগচির খাতিরের জন্যে সন্দেশ-রসগোল্লা পান্তুয়া-রাবড়ি সব থরে থরে সাজানো।

—কেমন দেখলেন আমার ফ্যাক্টরি, এবার বলুন!

—এসব কী জোগাড় করেছেন?

এস-কে-বাগচি এমনভাবে মিষ্টিগুলোর দিকে দেখলে যেন সে হীরে মুক্তো কি পান্না দেখছে।

শিরীষবাবু বললেন—এ-কিছু না, সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা, অতি সামান্য—

—কিন্তু এসব পেলেন কোথায়? এসব তো আজকাল দুর্লভ জিনিস মশাই!

শিরীষবাবু হাসলেন। বললেন—না না, এমন আর কী দুর্লভ বস্তু, কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি আপনার জন্যে।

এস-কে-বাগচি সিগারেট ধরালো একটা। বললে—মিষ্টি আমার চলবে না—

শিরীষবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—কিন্তু এ তো চিনির ডেলা নয়। ছানার মিষ্টি—

—তা হোক, কুকুরের পেটে কি ঘি সহ্য হয়—? আমরা হলুম সেই কুকুর!

—তা হলে তো বড় মুশকিল হলো, আপনাকে কিছু খাতির করতে পারলাম না—

—তাতে কী হয়েছে? অন্য কোনওদিন খাতির করবেন। রিপোর্ট তো আমি এখনই পাঠাচ্ছি না। সে পাঠাতে আরো দিন পনেরো লাগবে।

শিরীষবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী রকম দেখলেন আমার ফ্যাক্টরি?

এস-কে-বাগচী বললে—সত্যি কথা বলতে কি, আপনার ফ্যাক্টরি আসলে ফ্যাক্টরিই নয়—

শিরীষবাবুর মুখটা চকিতে একটু কালো হয়ে এল। কিন্তু তখুনি সামলে নিয়ে বললে—তাহলে কী হবে?

—দেখি কী করতে পারি—বলে এস-কে-বাগচি উঠে চলতে লাগলো বাইরের রাস্তার দিকে। বাইরে গোস্বামী দাঁড়িয়ে ছিল। শিরীষবাবু তাকে চোখ টিপে দিলেন। গোস্বামী এস-কে-বাগচীকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলে। বললে—কোন্ দিকে যাবেন স্যার আপনি?

এস-কে-বাগচি বললে—ভবানীপুর—

তা ভবানীপুরের দিকেই গাড়ি চললো। খানিক চলার পর গোস্বামী সামনের সীট থেকে পেছনের দিকে চেয়ে বললে—স্যার, যদি অনুমতি করেন তো একটা সিগারেট খেতে পারি?

—তা খান না, আমাকে বার-বার জিজ্ঞেস করার কী দরকার!

গোস্বামী পেছন ফিরেই দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকালে। বললে—ছি, স্যার, আপনি আর আমি? কী যে বলেন?

ভবানীপুরের পূর্ণ থিয়েটারের পাশের একটা রাস্তায় গাড়ি ঢুকলো। একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই গোস্বামী নেমে দরজা খুলে দাঁড়ালো। এস-কে-বাগচি দোতলার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওই আমার ফ্ল্যাট—

এস-কে-বাগচি বাড়ির ভেতরে চলে যাচ্ছিল। গোস্বামী বললে—স্যার, কিছু আদেশ করলেন না—

এস-কে-বাগচি এক সেকেণ্ড ভাবলে। তারপরে বললে—আচ্ছা, আপনি আসছে শনিবার আসুন—

—আসছে শনিবার কখন কোথায় ক'টার সময়?

—হোটেলে আসতে পারবেন?

গোস্বামী বললে—আদেশ করলেই আসতে পারবো। বলুন কোন্ হোটেলে?

—গ্রীণ গ্রোভে, সন্ধ্যে সাতটার সময়।

—ঠিক আছে স্যার, নমস্কার।

বলে গোস্বামী আবার গাড়িতে এসে উঠলো। তারপর গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে আবার সদর রাস্তায় পড়তেই গোস্বামী আর একটা সিগারেট ধরালো। লম্বা করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো রাস্তার দিকে মুখ করে। তারপর ড্রাইভারকে বললে—চলো অফিস চলো—

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই বেণুদিকে করপোরেশনের কাজে এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরতে হয়। সকালবেলাটা বাড়ি-বাড়ি টিকে দিয়ে-দিয়ে বেড়াতে হয়। একেবারে ঢুকতে হয় গিয়ে গেরস্থ-বাড়ির অন্দরমহলে। ঘন্টা দু'একের কাজ। কিন্তু তার মধ্যেই মা, দিদি, বোন, মেয়ে সম্পর্ক সকলের সঙ্গে। সকলের সঙ্গেই তাই একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আর একবার যখন মেয়েরা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন একেবারে হাঁড়ির খবর ফাঁস করতে তাদের দেরি হয় না।

কোন্ বাড়িতে কে কী দিয়ে ভাত খায়, কোন্ বাড়ির বউ পোয়াতি হলে সে-খবরও শুনতে হয়। শুনতে শুনতে বেণুদি মুখে দুটো আহা-উহু করে। তখন টিকে দেওয়াটা হয়ে যায় উপলক্ষ। বেণুদি কারো বাড়িতে ঢুকলেই সবাই হাঁড়ি-কড়া রেখে ছুটে আসে।

এমনি করেই একদিন হারান নস্কর লেনের সুসীকে এ লাইনে নিয়ে এসেছিল বেণুদি।

সেদিন অত ভোরে সুসীকে দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল বেণুদি

সাধারণত খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বেলা পড়লে তবে সব মেয়েরা আসে। কাউকে-কাউকে বা দরকার হলে খবর দিলেই এসে হাজির হয়।

—আমি এলুম বেণুদি।

—ওমা, তোর এ কী চেহারা হয়েছে মা?

কাঁদতে লাগলো সুসী। আঁচল দিয়ে বেণুদি তার মুখ মুছিয়ে দিলে। বললে—কাঁদিসনে বাছা, সকালবেলা কাঁদলে অকল্যেণ হয়।

—কিন্তু তুমি কাল কার সঙ্গে আমায় জুটিয়ে দিয়েছিলে বেণুদি! একেবারে জোচ্চোরের একশেষ! তার জন্যে আমায় থানায় যেতে হলো! আমাকে রাত এগারোটা পর্যন্ত হাজতে থাকতে হলো।

—সে কী রে? সেই পাঞ্জাবী ছেলেটা!

—হ্যাঁ, সেই সন্তোখ অরোরা। এদিকে কী মিষ্টি কথা বেণুদি। আমাকে জমি দেখালে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর ওপর পাঁচ কাঠা জমি দেখিয়ে ভুলিয়ে দিলে। বললে—আমার নামে ডীড লিখে দেবে, একটা পয়সা দাম নেবে না। আমিও গলে গেলাম। সিনেমা থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গে গেলাম লেকের ধারে। অন্ধকার গাড়ির ভেতরে বসে আমাকে চুমু খেলে—

—কেন, তুই আপত্তি করলি না?

সুসী কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমার তখন মরণ দশা হয়েছিল বেণুদি, আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, আমি জমির লোভে...

—তারপর!

—তারপর একেবারে থানায়। পুলিশ এসে আমাকে থানায় নিয়ে আটকে রেখে দিলে!

—কী সব্বোনাশ!—তারপরে কী করে ছাড়া পেলি তুই?

সুসী বললে—জামিনে!

—কে জামিন হলো?

—আমার দাদার এক বন্ধু। আমাদের পাড়ার 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র দিলীপ বেরা। লোকটাকে আমি দেখতে পারি না, তবু তাকেই কাল আমার পোড়া মুখ দেখাতে হলো—

বলে সুসী হাউ-হাউ করে সেইখানে বসেই কাঁদতে লাগলো।

বেণুদি বললে—ঠিক আছে, আমি ওই পাঞ্জাবী বেটাকে দেখাচ্ছি, আবার আমার কাছে আসতে হবে না? তা সে যাক গে। তুই থাক এখানে, আমি একটু কাজ সেরে আসবো—

সুসী বললে—তোমার এখানে ছাড়া আমার আর কোনও যাবার জায়গা নেই বেণুদি—

—তা ভালোই তো, থাক না তুই! আমি কি তোকে থাকতে বারণ করছি?

—কিন্তু আমি যে পুলিশের আসামী বেণুদি, আমাকে যে খুঁজবে তারা। আমি যে পালিয়ে এসেছি।

—তা সে-সব পরে ভাববো, আগে টিকে দিয়ে আসি, তারপর সব শুনবো। তুই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দে—

বলে বেণুদি সেজেগুজে বেরিয়ে গেল। সুসী একলা কিছুক্ষণ বসে রইল

ঘরের ভেতর। ভেতর থেকে ফ্ল্যাটের সদর দরজায় খিল দিয়ে দিয়েছে। বাইরে থেকে আর কারো আসবার উপায় নেই। এতক্ষণে যেন নিশ্চিত হলো সুসী। মনে হলো এতদিনে যেন মুক্তি পেলে সে সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে, সমস্ত প্রলোভন, প্রয়োজন, প্ররোচনা থেকে। এতদিন কে যেন তাকে তাড়া করতো, পেছন থেকে অনুসরণ করতো। কে যেন বলতো—আরো টাকা চাই, আরো রূপ চাই, আরও শাড়ি, গয়না, জুতো চাই। তারপর আরো বলতো—একটা বাড়ি দাও, এক টুকরো বাগান দাও, একটা শান্তির সংসার। এমন সংসার দাও যেখানে ইচ্ছেমত খরচ করতে পারবো।

বুধবারিরাও এমনি করে কোন্ ধাবধাড়া গোবিন্দপুর থেকে মাইলের পর মাইল হাঁটতে-হাঁটতে এসেছে মন্দিরে মসজিদে আর গীর্জায়। কেবল বলেছে—আরো টাকা দাও, আরো রূপ দাও, আরো শাড়ি আরো গয়না, আরো জুতো দাও। তারপর যখন সেগুলো মিটতো তখন বলতো—একটা বাড়ি দাও ভগবান, এক টুকরো বাগান দাও, একটা শান্তির সংসার দাও। এমন সংসার দাও যেখানে খুশীমত খরচ করতে পারি।

বুধবারির মা'র তখনও কলকাতা দেখা যেন ফুরোয়নি।

সেই যে হাওড়া-ময়দানে নেমে দেখতে সুরু করেছে, সে-দেখা আর পুরোন হয় না কিছুতেই। কেবল দেখে আর কেবল বলে—ইয়ে কেত্তা বড়া শহর হ্যায় বুধবারি!

বুধবারিও ধমক দেয় মাঝে মাঝে। বলে—চুপ রহো বুঢ়িয়া—

বউটা নিরীহ মানুষ। ডালহৌসী স্কোয়ারের সেই দেশোয়ালী আদমির বাড়িতে যা একটু চা খেয়ে নিয়েছে, তারপরেই আবার হাঁটা। আর তারপর শাড়ির গিঁটে বেঁধে যেখানে তাকে নিয়ে চলেছে, সেখানেই যেতে হচ্ছে। তার কোনও নিজস্ব ইচ্ছে নিজস্ব ইজ্জৎ নেই। তার মেয়ে হয়েছে, কিন্তু ছেলে তো হয়নি। ছেলে না-হওয়ার জন্যে একটা লজ্জা তার আছে। কিন্তু লজ্জার জন্যে কোনও দায়িত্ব তার থাকার কথা নয়। কালী-মাঈর যদি কিরপা হয় তো এবার তার ছেলে হবে। তাই বখরাটা নিয়ে চলেছে বুধবারি।

যদি তাকে কেউ বলে কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে সাত-দিন সাত-রাত না-খেয়ে উপোস করে কাটাতে হবে, তাও সে করবে। একটা লেড়কী দিয়েছ কালী মাঈ, এবার একটা লেড়কা দাও। আমার আদমীর ইজ্জৎ রাখো।

কলকাতার কোনও ঈশ্বর আছে কি না কে জানে। থাকলে বোধ হয় তার কানে তালা ধরে যেত এতদিনে। সকলেরই সব কিছু চাই। কলকাতার মানুষের জন্যে খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, গৃহ চাই। সুসীর টাকা চাই, গোস্বামীর উন্নতি চাই, অরবিন্দর সচ্ছলতা চাই, শিরীষবাবুর ইমপোর্ট লাইসেন্স চাই, দিলীপ বেরার ছানা পাওয়া চাই, বেণুদির পসার চাই, বুধবারির ছেলে চাই। চাই-চাই-এর কলরবে মুখর কলকাতার ভগবান কিন্তু দিব্যি নির্বাক হয়ে মিছিল দেখছে। নিচেয় ইনক্লাব জিন্দাবাদ আর ওপরে জুডি আর ক্লারা হবসন।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

বুধবারিদের মিছিলটা অরবিন্দদের মিছিলের একেবারে মুখোমুখি এসে পড়েছে।

বুধবারির বুড়ী মা তাজ্জব হয়ে গেছে—ও কেয়া হ্যায় রে বুধবারি? উঁহা কেয়া হো রহা হ্যায়?

বুধবারি আবার ধমক দিয়ে উঠলো—চুপ রহো বুঢ়িয়া, দিক্ মাত্ করো—

—লেকিন হোতা হ্যায় কেয়া?

বুধবারি বিজ্ঞের মতন বললে—উ লোক ভিখ মাঙ রহা হ্যায়—

তবু যেন বুধবারির মা'র বিশ্বাস হলো না। ভিক্ষে করছে? দল বেঁধে ভিক্ষে করে নাকি কেউ?

—হাঁ হাঁ ভিখ্ মাঙ রহা হ্যায়।

—কেয়া ভিখ্ মাঙ রহা হ্যায়!

বুধবাধি গম্ভীর গলায় বললে—কাম্!

কাম! বেকার নাকি সবাই? হয়ত তাই হবে। সবাই কাম চায়! জয়চণ্ডীপুরেও অনেকদিন কাম-কারবার থাকে না বুধবারির। তখন বড় কষ্ট হয় বুধবারির মা'র। খুচরো ফালতু কাজ বুধবারির। কাজ ফুরিয়ে গেলেই বুধবারি আবার কাজ খুঁজতে বেরোয়। তখন বাবু-মহাজনদের বাড়িতে যেতে হয় বুধবারিকে। দরজায় দরজায় তদবির-তাগাদা করতে হয়। এদেরও হয়ত তেমনি।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

বুধবারি সাবধান করে দিলে—এ্যাই, এক কিনারে বরাবর চলো—

মিছিলের জায়গা রেখে দিয়ে বুধবারির দল চলতে লাগলো সোজা দক্ষিণ দিক বরাবর। আর অরবিন্দদের মিছিলটা চলতে লাগলো উত্তর দিক বরাবর!

—কালী মাঈকী জায়!

সুসীর কানেও আওয়াজটা গিয়েছিল। জানালা দিয়ে বাইরের ট্রাম-বাসের রাস্তাটা দেখা যায় না স্পষ্ট করে। কিন্তু তবু দেখবার চেষ্টা করলে।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। একবার মনে হলো, রিসিভারটা ধরবে কি না। তারপর সেটা তুলে নিয়ে বললে—হ্যালো—

—বেণুদি?

সুসী বললে—বেণুদি বাড়িতে নেই—

—আপনি কে?

সুসী কি উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না হঠাৎ। তারপর বুদ্ধি করে জিজ্ঞেস করলে—বেণুদিকে কিছু বলতে হবে?

—আপনি কে বলুন?

সুসী বললে—আপনি কে কথা বলছেন আগে বলুন!

ওপার থেকে উত্তর এল—আমি গোস্বামী। বেণুদিকে বলে দেবেন আমি গোস্বামী টেলিফোন করেছিলুম! নিতাই-এর লোক—

সুসী আস্তে আস্তে রিসিভারটা রেখে দিলে। রেখে দিয়ে যেন স্বস্তি পেলে। অন্তত পুলিশ নয় এইটুকু জেনে শান্তি পাওয়া গেল। বেণুদির কোনও স্টুডেন্ট্ ক্লায়েন্ট হবে হয়ত!

সুরমা জীবনে কখনও এত বড় গাড়িতে চড়েনি। যেমন বড় তেমনি বাহারে। গাড়ির ভেতর ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়ো। শুয়ে শুয়ে কলকাতায় ঘুরে বেড়াও।

—ঠাকুরপো, সত্যি তুমি বেশ আছো ভাই!

—কেন, বৌদি? বেশ আছি কেন?

—তুমি বেশ রোজ গাড়ি চড়ে বেড়াও; কেউ তোমায় কিছু বলে না। আর আমি যদি এই রকম করে বেড়িয়ে বেড়াই তো তোমার দাদা আমায় বকে অস্থির করে দেবে! কী চমৎকার শহর ঠাকুরপো, কত বড় বড় বাড়ি! আর আমি সারাদিন কী-রকম ঘরে থাকি দেখেছ তো? আমার ঘরে বসে এসব কিচ্ছু দেখা যায় না।...আচ্ছা, ওটা কী ঠাকুরপো?

—ওটা হলো কেল্লা! একটু রাত্তির বেলা যদি বেরোও তো আরো অনেক মজা দেখতে পাবে। কত ফরসা-ফরসা সাহেব-মেমসাহেব দেখতে পাবে। দাদার সঙ্গে একদিন দেখতে বেরোও না কেন?

সুরমা বললে—তোমার দাদার জন্যে কি বেরোবার জো আছে ঠাকুরপো! দিন-রাত কেবল বই আর খাতা,—

গোস্বামী বললে—দাদাটা বড় বেরসিক বৌদি! অত রাত পর্যন্ত জেগে-জেগে কী পড়ে বলো তো?

সুরমা বললে—কী জানি, কী সব ছাই-ভস্ম লেখে কেবল—

—অত লেখাপড়া করে কী হয় মিছিমিছি! শুধু তো মাথার বোঝা বাড়ানো।

সুরমা বললে—আমি তো তাই বলি তোমার দাদাকে। বলি, তুমি কী সব ছাই-পাঁশ বই মুখে দিয়ে থাকো সারাদিন, অথচ গোস্বামী-ঠাকুরপোকে দেখ তো, লেখাপড়ার ধার দিয়ে কখনও যায়নি, কিন্তু কেমন বড়-বড় গাড়ি চড়ে বেড়ায়!

—তা শুনে দাদা কী বলে?

সুরমা বললে—বলবে আবার কী! শুনে চুপ করে থাকে!

গোস্বামী বললে—এই যে আজকে তুমি আমার সঙ্গে এসেছ, তা দাদা জানে? দাদাকে বলেছ?

—না, না, শুনলে কখনও আসতে দেয়! সে যা মানুষ। তোমার দাদা বাড়ি আসবার আগেই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিও কিন্তু ঠাকুরপো—

—নিশ্চয় পৌঁছে দেব।

তারপর হঠাৎ একটা গলির সামনে এসেই গাড়ি থামাতে বললে ড্রাইভারকে।

—এখানে আবার কোথায় যাচ্ছো ঠাকুরপো?

গোস্বামী বললে—তুমি একটু গাড়ির মধ্যে বোস বৌদি, এখানে আমার একটু কাজ আছে, আমি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে এক্ষুনি আসছি—

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বেশ লাগলো সুরমার। এমন করে গাড়ি চড়ে কলকাতা শহর ঘুরে বেড়ানো, এ যেন স্বপ্ন। এ যেন কল্পনার বাইরে। সুরমা চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। সবাই দেখুক তাকে। আশেপাশে যারা হেঁটে আসছে-যাচ্ছে তারা সবাই দেখুক যে সুরমা কত বড় গাড়ি চড়ে বেড়ায়।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

কত লোক প্রোসেশানের সঙ্গে দল বেঁধে চলেছে। লাল-শালু দিয়ে আবার

নিশেন বানিয়েছে। কত কথা লিখে দিয়েছে নিশেনের ওপর। সুরমার চোখের সামনে যেন আরব্য-উপন্যাসের খেলা চলতে লাগলো। কত বড় শহর কলকাতা। কত বড় জগৎ। তাদের হরতুকী বাগান লেনের তুলনায় এ যেন এক মহা পৃথিবী! এই পৃথিবীতে যেন একলা সুরমাই পরিক্রমা করতে বেরিয়েছে। দেখতে বেরিয়েছে তাদের বাড়ির গলিটার চেয়ে আরো কত বড় গলি আছে শহরে, সে-গলির বাড়ি-গুলোর ভেতরে কারা থাকে। তাদের ভাবনা-সমস্যাগুলো কী, কেমন তাদের চেহারা—

মিছিলটা আস্তে আস্তে চলে গেল উত্তর দিকে। সুরমা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগলো তাদের কথাগুলো—

মজুতদারের শাস্তি চাই।
সস্তাদরে খাদ্য চাই।
মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও,
নইলে গদী ছেড়ে দাও।

এস-কে-বাগচী তখন ওপরে গোস্বামীকে দেখে অবাক হয়ে গেছে।

—নমস্কার স্যার!

—কে? কী চাই আপনার?

—স্যার, আমি সেই গোস্বামী! ইন্টারন্যাশনাল গ্লাস ফ্যাক্টরি দেখতে গিয়েছিলেন আপনি। মনে পড়ছে না?

এস-কে-বাগচী কী করবে গোস্বামীকে নিয়ে, বুঝতে পারলে না। বললে—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—

তারপর বললে—আমার কাছে কিছু দরকার আছে আপনার?

—স্যার, আপনি বলেছিলেন শনিবার আসতে!

—হ্যাঁ, শনিবার তো গ্রীণ-গ্রোভে আসতে বলেছি, সন্ধ্যে সাতটার সময়।

—আজ এদিকে এসেছিলাম, তাই আর একবার জিজ্ঞেস করে গেলাম আর কি! সঙ্গে আমার গাড়ি রয়েছে, আপনি যদি কোথাও যেতেন তো পৌঁছিয়ে দিতে পারতুম স্যার—

—গাড়ি রয়েছে? জায়গা হবে?

—হাঁ স্যার, কী যে বলেন আপনি, খুব জায়গা হবে, আপনার জন্যেই তো গাড়ি এনেছি—গাড়িতে কেউ নেই, চলুন না—

এস-কে-বাগচীরা এসব সুবিধে নিতে অভ্যস্ত। বললে—দাঁড়ান, আমি একটু তৈরি হয়ে আসছি—বলে পাশের ঘরের ভেতরে চলে গেল। গোস্বামী বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। শিরীষবাবু তার ওপর যে কাজের ভার দিয়েছে সেটা সোজা কাজ নয়। শিরীষবাবুর এই ইমপোর্ট লাইসেন্স পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে অফিসের সমস্ত লোকের ভবিষ্যৎ। শুধু অফিসের সমস্ত লোকের নয়, শিরীষবাবুর নিজেরও ভবিষ্যৎ।

শিরীষবাবু বলতো—গোস্বামী, এই লাইসেন্সটা আমার পাওয়া চাই, নইলে শুধু ঘড়ি আর চোদ্দ ক্যারেট সোনা বেচে আর চলবে না—উপোস করবো—

গোস্বামী জানতো, উপোস করার কথাটা শিরীষবাবুর সত্যি নয়। কিন্তু তবু একটা বাঁধা আয় হঠাৎ কমে গেলে পেটে হাত পড়ে বই কি। বিশেষ করে শিরীষবাবুর মতন লোকের পক্ষে। শিরীষবাবু খরচে লোক। এদিকে ওদিকে দান-ধ্যান আছে। দশ-বিশটা লোক মাসের পয়লা তারিখে হাত পেতে রাখে তাঁর সামনে। সে রকম লোকের উপকার হোক, এটা গোস্বামী চায়।

প্রথম প্রথম একটু ভেবেছিল গোস্বামী!

হরিতকী বাগান লেনের মানুষের চোখে গোস্বামী যেন দিন দিন স্বর্গের জগতের মানুষ হয়ে উঠছিল। তাই বাড়িতে ঢোকার পথেই জানালা থেকে সুরমা-বৌদি ডাকতো।

গোস্বামীর মনে হতো বৌদি যেন সুখী নয়! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে স্বামী লেখা আর পড়া নিয়ে মশগুল থাকে, তার বউ-এর সুখী হওয়া সম্ভবও নয়। খাঁচার মধ্যে ধড়ফড় করা পাখীর মত মনে হতো সুরমাবৌদিকে। শনিবার দিন সন্ধ্যেয় পার্ক স্ট্রীটের হোটেলে এস-কে-বাগচীর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। কিন্তু দেখা কি শুধু-হাতে করবে?

ভূধরবাবু বলেছিল--না না, তাই কখনও হয়? ওরা তো দেবগুরু বৃহস্পতি নয়—ওসব যেন জোগাড় থাকে—

শিরীষবাবু বলেছিলেন—ভালো ভালো মিষ্টি এনেছিলাম মশাই বারাসত থেকে, এক টুকরো মুখে দিলে না—

—তাই কখনও মুখে দেয়? ওরা কি মিষ্টি খাবার লোক?

—তাহলে কী করা যায়? রিপোর্ট দেবার আগে একটু খাওয়ানো-দাওয়ানো তো ভালো। যাকে বলে নুন খাওয়ানো—নুন খাওয়ালেই ওরা গুণ গাইবে—

ভূধরবাবু বললে—তা গোস্বামী তো লেগে পড়ে আছে পেছনে?

—তা তো লেগে পড়ে আছে।

ভূধরবাবু বললে—তবে আর ভাবনা কী? ভেতরে ভেতরে তো আমার নৈবিদ্যি যাকে যা দেবার তা দেয়া আছে। শুধু ইন্সপেক্টরকে একটু খাতির করা, সেটা আপনার লোক করতে পারবে না?

—খুব পারবে, শুধু ভাবনা কী ভাবে খাতিরটা করবে!

—কেন. কী করে খাতির করতে হয় তা কি শেখাতে হয় কাউকে? কলকাতায় হোটেল-টোটেল নেই? বার নেই? একশো দুশো টাকার মদও তো খাইয়ে দিতে পারেন একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে—

—আর মেয়েমানুষ?

ভূধরবাবুরও ইচ্ছে ছিল কথাটা বলবে। বললে—মেয়েমানুষের প্রস্তাব দিয়েছে নাকি?

শিরীষবাবু বললেন—না না, সে রকম প্রস্তাব দেয়নি. কিন্তু আমি ভাব-ছিলুম যদি একেবারে মেয়েমানুষ নিয়ে গিয়ে হাজির করা যায় তো কেমন হয়?

ভূধরবাবু বললে—দিল্লিতে তো ও সব হরবক্‌ত্‌ চলছে। তা কলকাতাতে চালু হলেই বা দোষ কী! ছেলে-ছোকরারা সব ইন্সপেক্টর হয়েছে আজকাল—

শিরীষবাবু বললেন—তাহলে দেওয়াই ভালো, কী বলেন?

ভূধরবাবু বললে—সে যদি কেউ চায় তো দিতে হবে বৈকি!

শিরীষবাবু বললেন—তা সে আর এমন কী দুষ্প্রাপ্য জিনিস। সে আমার লোক আছে, সেই জোগাড় করে দেবে—

জিনিস দুষ্প্রাপ্য না হলেও তার জন্যে তো কাঠখড় পোড়ানো দরকার। শিরীষবাবুর সেজন্যে ভাবনা ছিল। এস-কে-বাগচিকে বাড়িতে পোঁছে দিয়ে এসে গোস্বামী আবার এসে দাঁড়ালো শিরীষবাবুর সামনে। শিরীষবাবুর আশে-পাশে যারা হাজির ছিল তাদের তিনি সরিয়ে দিলেন। বললেন—তোমরা পরে এসো—এখন যাও—

সবাই চলে যাবার পর গোস্বামী বললে—সব ঠিক হয়ে গেল স্যার, কোনও গোলমাল নেই—

শিরীষবাবু বুঝতে পারলেন না। বললেন—তার মানে? কি ঠিক হয়ে গেল?

—বাগচি সাহেবকে একেবারে বাড়ি পেশছিয়ে দিয়ে এলাম

—রাস্তায় কিছু বলছিল বাগচি সাহেব?

—লোক খুব ভাল স্যার। আমাদের ফ্যাক্টরি দেখে খুব খুশী!

শিরীষবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তাই বললে নাকি?

—আমার সঙ্গে আর ও সব কথা কী বলবে। তবু কথাবার্তায় মনে হলো আপনার ওপরে খুব খুশী!

কীসে বুঝলি তুই যে খুশী?

গোস্বামী বললে—আজ্ঞে, খুশী না হলে আসছে শনিবার দিন সন্ধ্যেবেলা দেখা করতে বলে কখনও?

—দেখা করতে বলেছে? কোথায়?

—আজ্ঞে, পার্ক স্ট্রীটের একটা হোটেলে। সন্ধ্যে সাতটার সময়।

—তাই নাকি?

গোস্বামী বললে—হ্যাঁ স্যার। বাগচি সাহেব বললেন, শিরীষবাবুর অফিসে গিয়ে মিষ্টি খেলুম না, উনি হয়ত কী মনে করলেন। কিন্তু কোনও কালে তো আমি মিষ্টি খাই না। যদি খেতে হয় তো এমন জিনিস খাই যে হোটেলে ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না—! তখন আমি বললুম—হোটেলেই খাওয়াবো আপনাকে স্যার। কোন্ হোটেলে খাবেন বলুন? তো বাগচি সাহেব বললেন—গ্রীণ গ্রোভ—

শিরীষবাবু বললেন—ঠিক আছে, শনিবার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—কখন? ক'টার সময়!

—সন্ধ্যে সাতটার সময়!

—তা কতো টাকার দরকার!

গোস্বামী বললে—দুশো টাকা হলেই চলে যাবে স্যার—

—না। ধমকে উঠলেন শিরীষবাবু।—দুশো টাকাতে কী করে হবে?

গোস্বামী বললে—গাড়ি সঙ্গে রয়েছে, বড় জোর হোটেলে গিয়ে ড্রিঙ্ক করবে। একটা লোক আর কত খাবে? একটা বোতল? তার বেশি তো কেউ খেতে পারবে না।

—কিন্তু শুধু ড্রিঙ্ক হলেই চলবে? দেবগুরু বৃহস্পতি তো কেউ নয়। সেটা

খেয়াল রেখেছিস?

গোস্বামী বললে—তা তো ভাবিনি স্যার,—

—ভাবিসনি তো এবার থেকে ভাব। বাড়িতে একদিন যা। ভাব-সাব কর, মেয়েমানুষের ঝোঁক আছে কিনা জেনে নে, তারপর তার ব্যবস্থা করবি—

কথাটা ভাল মনে হলো গোস্বামীর। সংসারে কোনও কাজ হাসিল করতে হলে একমন একপ্রাণ নিয়ে লেগে পড়ে থাকতে হয়, এটা তার জানা আছে।

—এই নে, যা—

বলে শিরীষবাবু এক তোড়া নোট এগিয়ে দিলেন গোস্বামীর দিকে। গোস্বামী সেগুলো নিয়ে পকেটে পুরলো। নোটগুলো শিরীষবাবুর সামনে গুণতে নেই। তাতে শিরীষবাবুর মেজাজ গরম হয়ে যায়।

—দেখবি যেন, যা বললুম, সব ঠিক মত হয়।

আর দাঁড়ালো না সেখানে গোস্বামী। মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো সমস্ত ব্যাপারটা। ইঙ্গিতটা শিরীষবাবুই দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়? যে-সে জিনিস নিলে তো চলবে না। ভদ্রঘরের জিনিস হওয়া চাই। বাজারের হলে বাগচি সাহেব বিগড়ে যাবে। কলকাতায় ও জিনিসের অভাব নেই। গোস্বামী জানে সেসব। একবার ওপাড়ার দালালদের খবর দিলেই তারা বাড়িতে এসে সাপ্লাই করে যাবে। কিন্তু তাতে তো বাগচি সাহেব তুষ্ট হবে না।

একদিন নিতাই-এর সঙ্গে দেখা হলো। নিতাই ও-পাড়ার বহুদিনকার মার্কা-মারা দালাল। সে সব কথা মন দিয়ে শুনলে।

তারপর বললে—দাদা, এ সব আমাদের কাজ নয়,—

—তাহলে কার কাজ?

—সে একজন আছে ভবানীপুরে।

—ভবানীপুরে?

—আজ্ঞে দাদা, হ্যাঁ। একজন মহিলা আছেন। টিকে দিয়ে বেড়ান। কিন্তু এই সব কাজে একেবারে পাকা, ঠিক যেমনটি চাইবেন, তেমনটি সাপ্লাই করবেন তিনি। কোনও গভর্নমেন্ট কনট্রাক্টের কাজ?

গোস্বামী বললে—হ্যাঁ, প্রায় সেই রকম—

—তাহলে আপনি সেখানেই যান। টাকা কী রকম খরচ করবেন? বাজেট কত আপনাদের?

গোস্বামী বললে—যা তিনি চান! টাকার জন্যে আটকাবে না।

নিতাই বললে—ঠিক আছে, আমি দাদা আপনাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি, চলুন—

সেই দিনই প্রথম গোস্বামী এসেছিল বেণুদির কাছে।

নিতাই-ই আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলে। মোটা বাজেট এদের। অনেক টাকার গভর্নমেন্ট কনট্রাক্ট! ভালো জিনিস সাপ্লাই করতে হবে। একেবারে পিওর জিনিস।

—কবে চাই?

গোস্বামী বললে—অনেক রকম জিনিস আছে আমার কাছে, কিন্তু আপনারা ভালো জিনিস চান, আমি ভালো জিনিসই দেব, আপনি পরশু একবার টেলি-

ফোন করবেন।

সেই বন্দোবস্ত অনুযায়ী ঠিক পরশু দিনই টেলিফোন করেছিল গোস্বামী। এদিক থেকে একজন মেয়ের গলা এসেছিল।

—কে? কাকে চাই?

গোস্বামী বলেছিল—বেণুদি কথা বলছেন?

—না। কী দরকার বলুন। তাকে কিছু বলতে হবে?

গোস্বামী কী বলবে বুঝতে পারেনি। তারপর বলেছিল—তিনি কোথায় গেলেন? কখন আসবেন?

—আপনি কে কথা বলছেন?

গোস্বামী বলেছিল—বলবেন আমি গোস্বামী! নিতাই-এর লোক—

এর পরেই টেলিফোনটা রেখে দিয়েছিল। তারপর কী করবে, কেমন করে কাজ হাসিল হবে তা বুঝতে পারেনি গোস্বামী। চাকরিতে থাকতে হলে মন দিয়ে কাজ না করলে উপায় নেই। শুধু মন নয়, হয়ত দরকার পড়লে বিবেকও জলাঞ্জলি দেওয়ার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। যে তা দিতে পারে সে-ই প্রকৃত চাকর। প্রভুর জন্যে যারা তা করতে পেরেছে, দুনিয়াদারিতে তারাই আজও প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছে।

গোস্বামী প্রথমটায় একটু দ্বিধা-সঙ্কোচের মধ্যে ছিল।

তারপরে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বেলাবেলি সেদিন রান্না করে নিয়েছে সুরমা। নিরঞ্জন কলেজ চলে গেছে দুটি ঝোল-ভাত খেয়ে নিয়ে। বলে গেছে—আজ আমার একটু দেরি হবে ফিরতে—

সুরমা রান্না সেরে খেয়ে-দেয়ে বাড়িওয়ালাদের মাসিমাকে গিয়ে বললে— আমি একটু আসছি মাসিমা—

মাসিমা বুড়ি মানুষ। বললে—ওমা, কোথায় যাচ্ছো বৌমা তুমি?

—আমি একটু এক জ্ঞাতির বাড়ি থেকে আসছি, উনি আসার আগেই চলে আসবো। একটু দেখবেন মাসিমা—

সদর দরজার পেছন থেকে খিল দিয়ে সেই যে অনেক দূর পর্যন্ত সুরমা হেঁটে এসেছিল তা আজও মনে আছে। গোস্বামী গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। সরল-সাধারণ গ্রামের প্রাণলক্ষ্মী একদিন পি-এল-৪৮০র প্রলোভনে গৃহপ্রাঙ্গণ ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালো। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে মানুষ গৃহস্থের দরজায় এসে ফ্যান চেয়েছে। দুমুঠো খিচুড়ি চেয়েছে। কিন্তু এমন করে আগে কখনও লজ্জা-সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মহননের পথে মটর-গাড়ি চড়তে চায়নি।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

গোস্বামী বলেছিল—বলো, তুমি কোথায় যাবে বৌদি—

সুরমা কী করে বলবে কোথায় যাবে সে। এই বিরাট কলকাতা, এখানকার সব জায়গাই তো তার কাছে রহস্য। চলো ঠাকুরপো, কলকাতা চলো।

তারপর সেদিন গোস্বামীর মাথায় এক মতলব এল। গোস্বামী কলকাতাই

দেখাবে বৌদিকে। দেখো, কলকাতা দেখো। ওই দেখো কী বিরাট বাড়ি, আর ওই দেখ কী বিরাট বস্তি। ওই দেখো মিছিল চলেছে রাজভবনের দিকে, আর ওই দেখ কত বড় কিউ হয়েছে সিনেমার সামনে!

দেখতে দেখতে সুরমার চোখের সামনে সমস্ত কলকাতা মিলিয়ে গেল। হঠাৎ খেয়াল হলো রাত হয়েছে। ঠাকুরপো কোথায় গেল!

—ঠাকুরপো, ঠাকুরপো—

সুরমা যেন পাগলের মত উন্মাদ হয়ে উঠলো। ঠাকুরপো, ঠাকুরপো—

সুরমার মনে হলো, তাকে এই এক গাড়ির ড্রাইভারের হেপাজতে রেখে সবাই যেন কোথায় পালিয়ে গেল। রাস্তায় মানুষের মিছিল। বাস-ট্রাম আটকে গেছে! কই, ঠাকুরপো কোথায় গেল তাকে এখানে বসিয়ে রেখে? কোথায় গেল ঠাকুরপো?

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

সুরমার এতক্ষণ ভয় করেনি। এতক্ষণ গাড়ি চড়ার আনন্দে সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। এবার আতঙ্ক হতে লাগলো যেন। আশেপাশের লোকগুলো যেন তাকে দেখছে মন দিয়ে। ঠাকুরপো তাকে গাড়ির মধ্যে রেখে কোথায় গিয়ে লুকিয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে না তাকে।

সুরমা এপাশ ওপাশ করতে লাগলো। কোথায় গেল ঠাকুরপো, গেল কোথায়?

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

হঠাৎ সাউথ-ইস্ট-এশিয়ার সমস্ত ফাঁকটা ভরাট হয়ে গেল একটা আর্তনাদে। ১৯৫৪ সালের ১০ই জুলাই আইন পাশ হলো আমেরিকার সিনেটে। লেখা হলো— Be it enacted by the Senate and House of Representative ইত্যাদি ইত্যাদি। আমেরিকার সিনেট থেকে ঝুড়ি-ঝুড়ি গম, আটা, ময়দা, তামাক, সব আসতে লাগলো। আসতে লাগলো মোটা-মোটা বই। এখান থেকে যাবে মাস্টার, ছাত্র, বৈজ্ঞানিক, ওখান থেকেও তারা আসবে। আসা-যাওয়ার আদম-সুমারিতে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা থাকবে—"ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নতির জন্য আমেরিকার দান। পাবলিক ল' ৪৮০।"

এমনি করে আমেরিকার অকৃপণ দান শুধু একলা ইণ্ডিয়াই পায়নি। ইণ্ডিয়ার সঙ্গে পেয়েছে আফ্রিকা, মালয়, ইরান, পাকিস্তান সবাই। তার সঙ্গে সঙ্গে কেউ পেয়েছে বোমা-বারুদ-প্যাটন-ট্যাঙ্ক-স্যাবার-জেট সব কিছু। যত খয়রাতি পেয়েছে তত জিনিসের দাম বেড়েছে, তত মানুষ বেকার হয়েছে; যত এড্ পেয়েছে তত চিৎকার করেছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

—কে?

শিরীষবাবু ঘটনাক্রমে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। গাড়িতে বসেই দেখতে পেলেন —তাঁরই তো গাড়ি, দাঁড়িয়ে আছে গলিটার সামনে। কে? গাড়িতে কে বসে আছে?

রামধনি ও-গাড়িটা নিয়ে গোস্বামীকে আনতে গিয়েছিল। গোস্বামী কোথায়?

শিরীষবাবু ড্রাইভারকে বললেন—এখানে একটু রাখো তো, রাখো তো—

গাড়ি থামলো। শিরীষবাবু হন্তদন্ত হয়ে নামলেন গাড়ি থেকে। তারপর গাড়িটার কাছে গিয়ে দেখলেন চেহারাটা ভালো। একে আবার কোথা থেকে জোগাড় করলে গোস্বামী!

—কে আপনি?

সুরমা মুখখানা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে। এ ভদ্রলোক আবার কে? ঠাকুরপো তাকে একলা ফেলে কোথায় গেল? ও ঠাকুরপো, কোথায় গেলে তুমি?

—কে আপনি? গোস্বামী কোথায় গেল?

সুরমা বললে—ঠাকুরপো আমাকে বসতে বলে কোথায় চলে গেল, এখনও আসছে না—

—আপনি কে? কোথায় থাকেন?

রামধনি এতক্ষণ বুঝি কোথাও গল্প করছিল। হঠাৎ সাহেবকে দেখে দৌড়তে দৌড়তে কাছে এসেই স্যালিউট করেছে।

—কোথায় থাকিস তুই? গোস্বামী কোথায় গেল?

রামধনি বললে—গোস্বামীবাবু তো এই সামনের কোঠিতে গেছে হুজুর—

শিরীষবাবু বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর সুরমার দিকে চাইলেন, বললেন—গোস্বামী আপনার কে?

সুরমা বললে—কে আবার? নিজের কেউ না। আমাদের পাড়ার ছেলে, ঠাকুরপো বলে ডাকি—

—বাড়িতে আপনার কে আছেন?

—আমার স্বামী আছেন।

—তিনি কী করেন?

—তিনি গোবরডাঙগা কলেজে মাস্টারি করেন।

—তাঁকে বলে এসেছেন? আপনি যে এখানে গোস্বামীর সঙ্গে এসেছেন, তা আপনার স্বামী জানেন?

সুরমা হতাশ দৃষ্টিতে তাকালো শিরীষবাবুর দিকে। বললে—না, তাঁকে বলে আসিনি—

—কেন, বলে আসেননি কেন?

—বললে তিনি আসতে দিতেন না।

শিরীষবাবু মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু সব বুঝলেন। সামনে দিয়ে প্রোসেশান চলেছে। ইনক্লাব বলে চেঁচাচ্ছে সবাই। শিরীষবাবু নিজেও এই কলকাতার আর এক মিছিলের শরিক। সে মিছিলে তিনি সকলের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আর এক দাবী জানিয়ে আসছেন। আর সকলের মত তাঁরও টাকা চাই, অগাধ টাকা, অসীম প্রতিপত্তি, অভ্রভেদী সম্মান, অজস্র সুখ, অখণ্ড ভোগসামগ্রী। এই কলকাতার কত অলিতে গলিতে এই তিনিই ঘুরেছেন এক-দিন নারীর সন্ধানে। অবৈধ সুখ আর সম্ভোগের উপচার নিয়ে তিনি কতদিন আসর জাঁকিয়ে ঐশ্বর্য বিলিয়েছেন। শুধু কি হারান নস্কর লেন? শুধু কি হরিতকী বাগান লেন? কোন্ লেন, কোন্ গলি বাকি আছে শিরীষবাবুর পদ-স্পর্শ পেতে?

কিন্তু মেয়েটার চোখ-মুখের ভাব দেখে যেন কেমন মায়া হলো শিরীষবাবুর। বললেন—আপনার বাড়ি কোথায়?

—হরতুকী বাগান লেন।

—কত নম্বর?

সুরমা বললে—তা জানি না। গলিটার ভেতর ঢুকেই বাঁদিকের শেষ বাড়িটা। আমার ঠাকুরপো'কে একবার ডেকে দিন না। আমাকে বাড়ি পেঁৗছে দেবে, এতক্ষণে আমার স্বামী বোধহয় কলেজ থেকে এসে গেছে—

—চলুন, আমার গাড়ি আপনাকে বাড়ি পেঁৗছে দেবে।

সুরমা বললে—কিন্তু ঠাকুরপো—?

—সে পরে আসবে, তার আসতে দেরি হবে। আপনি আমার এই গাড়িতে উঠুন।

সুরমার ভয়-ভয় করতে লাগলো। কা'র গাড়িতে সে উঠবে! লোকটা কে তাও জানা নেই।

বললে—আপনি কে? আপনার গাড়িতে আমি কেন উঠবো? আমার ঠাকুরপোকে আপনি ডেকে দিন। আমি তার সঙ্গে বাড়ি যাবো—

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল সুরমার মুখটা। এতক্ষণ যদি নিরঞ্জন এসে গিয়ে থাকে কলেজ থেকে!

শিরীষবাবু রামধনির দিকে চেয়ে বললেন—রামধনি, একে বুঝিয়ে দে তো, আমি কে—

রামধনি বুঝিয়ে দিলে সুরমাকে। সুরমা শিরীষবাবুর নাম শুনে অবাক হয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে দিলে। তারপর মুখটা নিচু করে বললে—আমি ঠাকুরপোর কাছে আপনার নাম শুনেছি—

শিরীষবাবু বললেন—আপনার কোনও ভয় নেই, আমি নিজে আপনাকে বাড়ি পেঁৗছিয়ে দেব—

সুরমা বললে—কিন্তু আমি আমার বাড়ির সামনে আপনার গাড়ি থেকে নামবো না, আমাকে একটু দূরে নামিয়ে দেবেন, নইলে সবাই দেখে ফেলবে—

গাড়ি তখন চলছে। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসেছেন শিরীষবাবু।

সুরমা আবার বললে—ঠাকুরপো আমাকে খুব খুঁজবে, কিছু বলে আসা হলো না—

শিরীষবাবু বললেন—তা খুঁজুক, কেন ওর সঙ্গে আপনি বেরোলেন? কী জন্যে?

সুরমা বললে—আমি বাড়ির মধ্যে থাকি, কিচ্ছু দেখতে পাই না, তাই ঠাকরপো বলেছিল আমাকে মটর গাড়িতে করে সব দেখাবে—আমি কখনও মটর গাড়ি চড়িনি—

—গোস্বামীকে আপনি কতদিন চেনেন?

—ওমা, ঠাকুরপোকে কি আজ থেকে চিনি? রোজ কেবল আমাকে বেড়াতে যেতে বলে, তাই আমি ভাবলাম আজকে উনি দেরি করে ফিরবেন কলেজ থেকে, আজ যাই—

শিরীষবাবু বললেন—আর কখনও কারোর সঙ্গে এমন করে কলকাতা দেখতে

বেরোবেন না, সে আপনার ঠাকুরপোই হোক আর যাই হোক, কলকাতার কাউকে বিশ্বাস করবেন না—

সুরমা বললে—কিন্তু আপনার কথায় তো আমি বিশ্বাস করলাম, আপনার কথায় বিশ্বাস করে যে আপনার গাড়িতে উঠলাম—

শিরীষবাবু বললেন—আমাকে বিশ্বাস করবেন না—

—কেন? ও কথা বলছেন কেন?

—কলকাতায় কাউকেই বিশ্বাস করতে নেই বলেই ও-কথা বলছি।

—কেন, কেউ এখানে ভালো লোক নেই বুঝি?

শিরীষবাবু বউটার কথায় অবাক হয়ে গেলেন। এমন একজন বউকে গোস্বামী এখানে নিয়ে এসেছে। গোস্বামীটা আসল হারামজাদা!

বললেন—ভালো লোক? ভালো লোক অভিধানে আছে—ছাপানো বইতে আছে—

বলে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ! কেন যে এ-রকম হলো কে জানে। এমন তো কখনও হয়নি আগে শিরীষবাবুর। বরাবর খুঁজে বেড়িয়েছেন কোথায় পাওয়া যাবে ভোগ, শুধু ভোগ নয়, অবৈধ সম্ভোগের উপচার। তিনি নিজেই অবাক হয়ে গেলেন নিজের ব্যবহার দেখে।

সুরমাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এসেই খুব ধমক দিলেন গোস্বামীকে।

—তুই লোক চিনলি নে গোস্বামী? ও তুই কাকে নিয়ে এসেছিলি গাড়ি করে? ও কে তোর?

—আজ্ঞে, ও তো আমার পাড়ার বৌদি।

—দূর হারামজাদা, তোর একটা আক্কেল-বিবেচনা বলে কিছু নেই? কাজ হাসিল করতে হবে বলে কি লজ্জা-ভদ্রতার বালাই বলে কিছু থাকবে না? আর মেয়েমানুষ পেলি না? বাজারে কি মেয়েমানুষের দুর্ভিক্ষ হয়েছে? এতদিন এ লাইনে আছিস, এ বুদ্ধি তোর হলো না?

সেদিন গোস্বামীর বড় লজ্জা হয়েছিল। অথচ এ-সব কথা কাউকে বলাও যায় না। গোস্বামীর মনের দুঃখ কেউ বুঝবে না। কেউ বুঝবে না কত মেহনত করে তাকে সংসার চালাতে হয়। কত কষ্ট করে শিরীষবাবুর পারমিট লাইসেন্স সব কিছু জোগাড় করে দিতে হয়। বাগচি সাহেবও অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—তোমাকে তো খুব খাটতে হয় গোস্বামী, কখন বেরিয়েছ?

সে-সব কথায় কান না দিয়ে রামধনিকে জিজ্ঞেস করলে গোস্বামী—কীরে রামধনি, বৌদি কোথায় গেল? বৌদিকে যে গাড়িতে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম?

—হুজুর, ও তো সাহেব নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে।

—সে কীরে? সাহেব এখানে কোত্থেকে এল? সাহেব এ-পাড়ায় এসেছিল নাকি?

তাজ্জব কাণ্ড। গেল কোথায় তাহলে? বৌদিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সাহেব বাগানবাড়িতে গেল নাকি? কি আশ্চর্য!

এস-কে-বাগচি পেছনে বসে ছিল। গোস্বামী পেছন ফিরে বললে—একটু অনুমতি দেবেন স্যার, সিগারেট খাবো—

খানিক পরেই বাগচি সাহেব বললে—থামো—থামো—

একটা হোটেল। হোটেলের সামনেই গাড়ি দাঁড়ালো। বাগচি সাহেব নামতেই গোস্বামী মনে করিয়ে দিলে—তাহলে শনিবার ঠিক সন্ধ্যে সাতটায় স্যার—

বাগচি সাহেব সে-কথার উত্তর না দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল।

কালিঘাট ট্রাম-ডিপোর সামনেই ওরা বসে থাকে।

ট্রাম-বাস থেকে যে-সব যাত্রী নামে তাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে ওরা। অনেকে নিজেরাই পাঁঠা কিনে আনে। বেশ নধর পুষ্ট দেখে পাঁঠা আনা যায় বাইরে থেকে। কিন্তু কালী-মন্দিরের গায়ে যেসব পাঁঠা বিক্রি হয় তাদের দেখতে কচি বটে, কিন্তু আসলে বয়েসে বুড়ো। না-খাইয়ে-খাইয়ে তাদের রোগা মরকুটে করে রেখেছে ওরা। কচি পাঁঠার দর বেশি। ওই বুড়ো-মরকুটে পাঁঠাগুলোকেই ওরা কচি বলে চালায়—

সুরু হয় সেই ট্রাম-ডিপোর কাছ থেকে। সেখান থেকেই দরদস্তুর দরকষাকষি, টানাটানি মারামারি, আর ধরাধরির সূত্রপাত।

কেউ চুপটি করে গাছের ছায়ায় রাস্তার ওপরেই উবু হয়ে বসে থাকে।

আবার কেউ বিড়ি টানে, কেউ সিগারেট খায়। কেউ আবার তারই ফাঁকে এক ভাঁড় চা নিয়ে চুমুক দেয়।

কিন্তু সকলেরই চোখ একমুখী। দূর থেকে লোক দেখলেই ওরা চিনতে পারে। গোঁফ দেখলেই ইঁদুর যেমন শিকারী বেড়ালকে চেনে। কেউ নামে নতুন জামা-কাপড় পরে, কেউ খালি গায়ে। ওই কালি-টেম্পল রোডের মোড় থেকেই ওদের দেখা যায়।

ওরা বলে—মন্দিরে পুজো দেবেন নাকি মা?

কেউ জিজ্ঞেস করে—মা'কে দর্শন করবেন বাবুজী? আমি মায়ের পুরোন পান্ডা আছি, গঙ্গাজীমে স্নান করবেন, পুজো দেবেন। হামি সব কুছুর বন্দোবস্ত করে দেব বাবুজী—

ওদিক থেকে আর একজন চিৎকার করে ওঠে—এই, বেরো শালা এখান থেকে! আমার যজমান ভাঙাচ্ছিস! হুকুমচাঁদ ভাটিয়া আমার পৈতৃক যজমান, সেই ফ্যামিলির লোক, হীরের বোতাম দেখে চিনতে পারছিস না?

হীরের বোতাম পরে যারা আসে তারা অবশ্য হেঁটে আসে না। বিরাট বিরাট সব গাড়ি। এই বিলিতি-টাকার কম্‌তির যুগে কোত্থেকে যে সে-সব গাড়িগুলো আমদানি হয় তা কেউ বলতে পারে না। গাড়িগুলো হুড়মুড় করে একেবারে পান্ডাদের গায়ের ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তবু তারা দমে না। কোনও রকমে সামলে নিয়ে হাওয়া-গাড়ির পেছন-পেছন দৌড়োয়। পাঁই-পাঁই করে দৌড়োয়। দৌড়তে দৌড়তে যেখানে এসে থামে সেটা মন্দিরের পেছন দিক। সেইখানে এসেই তদবির সুরু হয়ে যায়—আমি লছমন পান্ডার পোতা হুজুর, আমি মন্দিরের হেড পান্ডা হুজুর...

কিন্তু যেদিন হরতাল হয়, স্ট্রাইক হয়, বাস-ট্রাম চলে না, রাস্তায় রাস্তায়

পুলিশ টহল দিয়ে বেড়ায়, সেদিন বড় মুশকিল হয় এদের। এই কালিঘাটের পাণ্ডা আর তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের। সেদিন আর বাজার-খরচটা ওঠে না। চার আনা, চার আনাই সই। দু আনা দু আনাই সই। একটা দোকানে গিয়ে তোমার নামে সওয়া পাঁচ আনার ডালা সাজিয়ে একেবারে মায়ের মাথায় চড়িয়ে দেব। আমি লছমন পাণ্ডার পোতা, আমি মন্দিরের হেড পাণ্ডা হুজুর—

সেদিন ইনক্লাব দেখে পাণ্ডাদেরও কেমন ভয় লেগে গিয়েছিল। আর বোধ হয় কোনও যাত্রী এলো না আজ। এক-একটা করে অনেকগুলো বিড়ি ফুঁকেও কোনও সুরাহা হলো না। সকাল থেকে একটা যাত্রীরও টিকি দেখা যাচ্ছে না।

লছমন পাণ্ডার নাতি শিউকিষণ আসলে পাণ্ডাই নয়, ছড়িদার। তবু দুটো পয়সা পাবার জন্যে যজমানের কাছে পাণ্ডা বলে নিজের পরিচয় দিতে হয়। সেদিন ভোর বেলাই উঠেছে শিউকিষণ। ভোর বেলাই চান করে নেওয়া এদের নিয়ম। তখন কালিঘাটের মন্দিরে দিনের আলো ফোটেনি। অত ভোরেও ঢং-ঢং করে ঘন্টা বাজে। যাত্রীরা এসে মায়ের মন্দিরে ডালা দেয়। মন্তর পড়ে। তারপরে যত বেলা বাড়ে হাড়িকাঠের কাছে জমা হয় যাত্রীরা। কারো মানত আছে পাঁঠা বলি দেবে। কেউ মামলায় জিতেছে, হাইকোর্টের রায় বেরিয়ে গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে কালিঘাটে এসে একটা নধর দেখে পাঁঠা কিনে নিয়ে উৎসর্গ করে দিয়েছে মায়ের নামে। সেই পাঁঠাকে গঙ্গায় স্নান করিয়ে পুরুত ডেকে পুজো করতে হবে। পুরুতকে দক্ষিণা দিতে হবে। তারপর বলি। কামাররা সাত-পুরুষ ধরে ওই কাজ করে আসছে। মন্দিরের পুণ্যার্থীদের বাসনা-কামনা-আকাঙ্ক্ষার বলি দিয়ে মজুরির সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠার মুণ্ডুটা ফাউ জুটবে।

কিন্তু সেদিন কেউ এল না। সমস্ত মন্দির থম-থম করছে। যাত্রী নেই, তবু ফাঁকা ঘন্টাটা ঢং-ঢং করে বাজিয়ে দিলে হেড পুজারী-বামুন মশাই—। এমন সময় ট্রাম-রাস্তার মোড়ে হাজির হলো বুধবারিদের দল। কাঁধে একটা পাঁঠা। বেশ নধর চেহারা। ও আর দেখতে হয় না, না দেখেই চেনা যায়।

—জায়, কালীমাঈকী জায়!

শিউকিষণ দৌড়ে গিয়ে বুধবারিকে আঁকড়ে ধরেছে। আর ওদিক থেকে কালি হালদার। সে এতক্ষণ বিড়ি খাচ্ছিল একখানা আধলা ইটের ওপর বসে বসে।

সেও ঝাঁপিয়ে পড়েছে বুধবারির ওপর। জায়, কালী মাঈকী জায়!

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

যেন ঠিক একই সঙ্গে গর্জন করে উঠলো ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা। আমরা এড দিচ্ছি, তার বদলে তোমরা আমাদের সেলাম দিচ্ছ না কেন? নেমক্-হারাম, আন্‌গ্রেটফুল জাত, আমরা তোমাদের জন্যে কত মেহনত করছি, তোমাদের ফুড নেই দেখে আমরা কত দয়া করছি, করুণা করছি। আমরা বাড়তি গম, ধান, দুধ, সব কিছু তোমাদের জন্যে পাঠাচ্ছি আর তোমরা আমাদের ধন্যবাদটুকুও তো কই দিচ্ছ না।

সেই কথাই সেদিন স্ট্র্যাণ্ড হোটেলের ঘরে বসে বলছিল জুডি হবসন।

এই হোটেলের ভেতরেই আর একটা দল এসেছে আমেরিকা থেকে। তারা ফাউণ্ডেশনের টাকা পেয়ে ডেভেলপিং কান্ট্রির মানুষদের কল্যাণের জন্যে অনেক কষ্ট করে দল বেঁধে এখানে এসেছে। তারা জানতে এসেছে কলকাতায় প্রব্‌লেম

কী! এই কলকাতার লোক কী চায়। জানতে এসেছে এখানে বাসে-ট্রামে এত ভিড় কেন হয়। জানতে এসেছে এ-ভিড় কমানো যায় কী করে। আরো জানতে এসেছে এখানকার লোকের আর্থিক অবস্থা কেমন, এখানকার মানুষের মাথা-পিছু আয় কত। এই গরীব মানুষদের কী করে কমিউনিস্টদের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

জুডি বললে—ডু ইউ নো মিস্টার পারকিনসন, তুমি কি জানো, এখানকার হাঙরি লোকরা এখনও ব্রিটিশদের চায়?

মিস্টার পারকিনসন হোয়াইট-লেবেল-এর গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলে—হাউজ্ দ্যাট?

—ইয়েস, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। দে ওয়ান্ট আস, দি ব্রিটিশ। দে হ্যাভ টোলড্ মি সো—তারা আমাকে সে-কথা বলেছে—

পারকিনসন-এর তখন বেশ নেশা হয়েছে। বললে—ভেরি ইন্টারেসটিং—তারপর?

ফাউণ্ডেশনের লোকেরা ইণ্ডিয়ার টাকায় এসেছে অনেক দূরের দেশ থেকে। একদিনে অনেক টাকার হোয়াইট লেবেল আর অনেক টাকার সিগারেট উড়িয়েছে। মাথা ঘামাতে ফাউণ্ডেশনের মেম্বারদের অনেক পরিশ্রম হয়েছে। তবু সমাধান হয়নি সমস্যার। সেন্টার বলছে টাকা নেই, হোয়াইট-হাউস বলছে আমরা টাকা দেব। কিন্তু ইণ্ডিয়ার ফাইন্যান্স মিনিস্টার বলছে অত টাকা আমরা কলকাতার পেছনে খরচ করতে দেব না।

—কেন?

এই কেনর উত্তর পেতেই বছরের পর বছর কেটে গেছে। ফাউণ্ডেশন থেকে দলের পর দল একস্‌পার্টরা এসেছে আর শুধু প্ল্যানিং করেছে। এখানে সারকুলার রেল করবে, মানুষকে আর বাদুড়ের মত ঝুলে-ঝুলে অফিসে-কাছারিতে যেতে হবে না। এখানে বাড়ির অভাবে আর মানুষকে একটা ঘরের মধ্যে বেড়াল-ছানার মত বাস করতে হবে না। এখানকার মানুষ খেতে পাবে, পরতে পাবে, বাঁচতে পাবে, মানুষের মত মাথা উঁচু করে চলতে পাবে। সেই প্ল্যানই তো দিয়ে গেছে এক্সপার্টের দল। কিন্তু...

কথা বলতে বলতে অনেক রাত্রে নেশায় বুঁদ হয়ে আসে এক্সপার্টদের চোখ। সারাদিন কলকাতার মানুষদের জন্যে ভেবে ভেবে তারা অস্থির হয়েছে। সেই ১০ই জুলাই ১৯৫৪, যেদিন থেকে পি-এল ৪৮০ আইন পাশ হয়েছে, সেদিন থেকেই তারা আসা-যাওয়া সুরু করেছে। আর ইণ্ডিয়ার উন্নতির কথা ভেবে ভেবে তারা অস্থির হয়েছে।

শুধু মিস্টার পারকিনসন নয়। সঙ্গে আরো এক্সপার্টের দল আছে। তারাও হোয়াইট-লেবেলের নেশা দিয়ে কলকাতার মানুষের দুর্দশার কথা ভুলতে চেয়েছে। তারপর যখন সব এনকোয়ারি শেষ হয়েছে তখন একদিন প্রেস-কনফারেন্স ডেকেছে। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ডেকে চা-কফি-কক্‌টেল-পার্টি দিয়েছে।

প্রেস-কনফারেন্সে মিস্টার পারকিনসন বলেছে—ইণ্ডিয়া এক ডেভেলপিং কান্ট্রি। একদিন এ-শহর পাঁচ লক্ষ লোকের জন্যে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু লোক এখন বেড়েছে। এখন এখানে ষাট লক্ষ লোক বাস করছে, কিন্তু এ শহর বাড়েনি

শহরের জলের সাপ্লাই বাড়েনি, শহরের বাড়ির অভাব মেটেনি, শহরের ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থা হয়নি। কিন্তু আমরা এসেছি এই শহরের মানুষদের বাঁচাতে। কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এ-শহর না-বাঁচলে ইণ্ডিয়া বাঁচবে না। আর এ কলকাতা-শহরকে বাঁচাতে হলে এর কমার্স, এর কালচার, এর সমাজ-ব্যবস্থা, এর সংসার, এর মানুষকেও বাঁচাতে হবে। একদিন যুদ্ধ হয়েছিল, সেকেণ্ড গ্রেট্ ওয়ালর্ড ওয়ার। সে-ওয়ারে ক্যালকাটা ভাইট্যাল রোল প্লে করেছিল। এখানে এই কলকাতা শহর ছিল সাউথ-ইস্ট-এশিয়ার সাপ্লাই-বেস। এই সাপ্লাই-বেস থেকেই এখানকার মানুষ পৃথিবীর শান্তির জন্যে অর্থ দিয়েছে, ইজ্জত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে, ফুড দিয়েছে, যা-কিছু সবই জুগিয়েছে এই শহর। তার ফলে দুর্ভিক্ষ হয়েছে এই কলকাতাতেই। এই দেশ দুভাগ হওয়ার ফলে রেফিউজীরা এসে মাথা গুঁজেছে এই শহরেরই আনাচে-কানাচে। সুতরাং পোস্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়ার স্বার্থে এই শহরের মানুষ যা কিছু স্বার্থত্যাগ করেছে তার জন্যে সে কোনও মূল্যই পায়নি। কোনও স্বীকৃতিই পায়নি। তাই সেই শহরের ইমপ্রুভ-মেন্টের জন্যে আমরা ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গ্যানিজেশান-এর হয়ে এখানে এক্সপার্টের দল এসেছি। এবার আশা করছি এই শহরের বহুদিনের অসুবিধে দূর হবে। যাতে তাড়াতাড়ি তা হয়, তার ব্যবস্থা আমরা করছি। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমরা যে প্ল্যান তৈরি করেছি, তা অচিরেই কার্যকরী হবে—

প্রেস-কনফারেন্সে যা-কিছু হবার তা হয়েছে। কিছু কলম, কিছু কাগজ, কিছু কালি নষ্ট হয়েছে। আর এক্সপার্টের দল রিপোর্ট দিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেনে চড়েছে।

কিন্তু তবু সুসীরা আর ঘরে ফিরে যায়নি। অরবিন্দরা এক-কিলো মাংস কিনে নিয়ে গিয়ে গোপালদের খাওয়াতেও পারেনি, অরবিন্দদের মায়েদের অন্ধ চোখে চশমাও ওঠেনি। শিরীষবাবুদের দেওয়া রাবড়ি খেয়ে আফিমের নেশায় শুধু মৌতাতে মেতে থেকেছে।

আর ওদিকে পি-এল-৪৮০-র দেনা কেবল দফায় দফায় বেড়েছে।

সেদিন আবার টেলিফোন।

—কে?

—আমি গোস্বামী, বেণুদি।

—কী খবর?

—আমি সেদিন টেলিফোন করেছিলাম তোমাকে। তুমি ছিলে না।

বেণুদি বললে—কাজের কথা টেলিফোনে হয় না ভাই, তুমি সামনে এসো। এখানে এসে কথা বলতে হবে—

ঠিক আছে। গোস্বামী সেদিন ভুল করেছিল। মনে মনে আফসোস করেছে সেদিন খুব।

শিরীষবাবু বললেন—তোর কোনও বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই গোস্বামী—কোন্‌দিন তুই জেল খাটবি দেখছি—কী বলে তোর পাড়ার বউকে গাড়িতে উঠিয়েছিলি, শুনি? কে তোকে ও-মতলব দিলে?

গোস্বামী বললে—কেউ মতলব দেয়নি স্যার, বৌদি নিজেই বলেছিল। বৌদিই অনেকদিন ধরে মটরে চড়ে কলকাতা দেখতে চাইছিল—

—তা'বলে গেরস্থ বউকে নিয়ে হাঁড়িকাটে বলি দিবি?

গোস্বামী মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললে—আজকাল স্যার অমন তো আকছার হচ্ছে—

—হোক। তুই একটা গাধা! তোর একটা আক্কেল বলে কিছু নেই! বাগচি কি গেরস্থ মেয়েমানুষ চেয়েছে?

—না, তা চায়নি। মেয়েছেলের কথাই মুখ ফুটে বলেনি বাগচি সাহেব!

—তা ভালো করেছিস! ও-সব কেউ মুখ ফুটে কখনও বলে?

গোস্বামী বললে—আমি ভেবেছিলাম বাগচি সাহেবকে একটু বেশি খুশী করে দেব আর কি—

শিরীষবাবু বললেন—খবরদার, সব দিক ভেবে-চিন্তে কাজ করবি।

সেই কথাই ঠিক ছিল। গোস্বামী টাকাগুলো পকেটে পুরে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। তারপর সেখান থেকে সোজা গিয়ে উঠলো একেবারে পার্ক স্ট্রীটের গ্রীণ-গ্রোভে।

কাঁটায় কাঁটায় তখন সন্ধ্যে সাতটা বেজেছে।

একটা বড় কেবিন দেখে সেখানে গিয়ে ঢুকলো। হোটেলের বয় এসে সেলাম করলে।

আর সংগে সংগে এসে হাজির হলো বাগচি সাহেব।

—এসেছেন? আমি আপনার জন্যে হাঁ করে বসে আছি স্যার। বসুন!

এস-কে-বাগচি বসলো।

—কী খাবেন?

এস-কে-বাগচি বললে—ব্ল্যাক ডগ—

ব্ল্যাক ডগ এল। এস-কে-বাগচির বড় ফেভ্‌রিট ড্রিংক।

—আপনি খান?

গোস্বামী বললে—আপনি অনুমতি না করলে কী করে খাই স্যার—

এক চুমুক দিয়েই গোস্বামী উঠলো।

—স্যার, কিছু মনে করবেন না, একটা ভুল হয়ে গেছে, চাবিটা ভুলে এসেছি—

—কীসের চাবি?

—অফিসের ক্যাশের চাবি। আমি যাবো আর আসবো—

তারপর হঠাৎ পকেট থেকে নোটগুলো বার করলে।

বললে—এই টাকাগুলো রাখুন স্যার,—

—কেন, টাকা রাখবো কেন?

—আপনার কাছে একটু রেখে দিন স্যার, আমার যদি একটু আসতে দেরি হয়!

বলে উঠলো। তারপর তাড়াতাড়ি বাইরে এসেই গাড়িতে উঠে বসলো। বললে—রামধনি, শিগগির চলো, একটু ভবানীপুরে যেতে হবে, শিগগির—

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

—বলো ভাই, ইনক্লাব জিন্দাবাদ!!

অরবিন্দ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কেলো-ফটিক বললে—কী ভাবছেন অরবিন্দবাবু—চেঁচান, চেঁচান।

অরবিন্দ চিৎকার করে উঠলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

কেলো-ফটিক পকেট থেকে কী যেন বার করে মুখে পুরে দিলে।

—কী খাচ্ছো ভাই?

কেলো-ফটিক বললে—চিনেবাদাম ভাজা—পকেটে কিনে রেখেছি দু' আনার, যদি খিদে পায়, তা আপনিও কিনে রেখে দিলে পারতেন—

অরবিন্দ বললে—আমি তো জানতুম না ঠিক, এখন একটু-একটু খিদে পাচ্ছে—

কেলো-ফটিক বললে—খাবার জন্যে আমি আটার রুটি এনেছি, আপনাকে দেব'খন—

—আটার রুটি? তোমরা সবাই এনেছ?

কেলো-ফটিক বললে—অনেকেই এনেছে, কেউ-কেউ পরোটা আর আলুর দম করে নিয়ে এসেছে। প্ল্যাস্টিকের প্যাকেটে মুড়ে এনেছে। আপনার কিছু ভাবনা নেই, একটু পরেই সবাইকে কোয়ার্টার-পাউন্ড পাঁউরুটি দেবে—

—কারা দেবে?

—কেন, আমরা এত খাটছি, অম্‌নি অম্‌নি? আমাদের মেহনত হচ্ছে না? ফিরে যাবার বাস-ভাড়াও দেবে আমাদের—

তা সত্যিই তাই। খানিক পরে দলের একজন মাতব্বর এক ঝুড়ি পাঁউরুটি নিয়ে সামনের দিকে দৌড়তে লাগলো।—কেউ লাইন ভেঙো না, দু'জন করে চলো।

পাঁউরুটির লোভে যারা লাইন ভাঙতে গিয়েছিল, তারা আবার লাইন মেনে চলতে লাগলো। আর বেশি দেরি নয়। এবার সোজা পা চালিয়ে চললেই একেবারে রাজভবন। কে একজন বললে—ওখানে পুলিশ লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে এগোতে দেবে না। এগোতে না দিক, আমরা তবু এগোব, পুলিশের সাধ্যি থাকে আমাদের আটকাক।

আবার একবার হুড়োহুড়ি পড়লো। পাঁউরুটি! পাঁউরুটি।

—সকলকেই পাঁউরুটি দেওয়া হবে, কেউ লাইন ভাঙবে না। ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

—কী হলো অরবিন্দবাবু? অত অন্যমনস্ক কেন? সামনে দিয়ে পাঁউরুটি চলে গেল, নিলেন না?

সত্যিই খেয়াল ছিল না অরবিন্দর। সুসীটা বাড়ি থেকে চলে যাবার পর থেকেই মনটা খারাপ হয়ে ছিল। জামীনের আসামী। দিলীপদা কী ভাববে! যদি আর না পাওয়া যায় সুসীকে। সুসী যদি আর বাড়ি ফিরে না আসে?

মা সেদিন বলছিল—হ্যাঁরে, তোর সেই বন্ধু আর আসে না তো?

—কোন্ বন্ধু?

—সেই যে খুব বড়লোক, এক কিলো রাবড়ি দিয়েছিল, খুব ভালো রাবড়ি

ছিল সেটা, তেমন রাবড়ি আর কখনও খেলুম না!

অরবিন্দ রেগে গিয়েছিল। বলেছিল—কেন আসবে সে? কেন আর রাবড়ি দেবে তোমাকে? এ-বাড়িতে এসে কি সে খাতির পায়? কেউ কি তাকে এক-কাপ চা হাতে তুলে দিয়েও খাতির করে? তার বুঝি মান-অপমান জ্ঞান নেই?

—কেন, বৌমা খাতির করতে পারে না একটু? আমার চোখ গেছে, আমি কানা মানুষ তাই, নইলে আমি নিজেই খাতির করতুম—

অরবিন্দ বলেছিল—কেন, তুমি ছাড়া কি খাতির করবার মানুষ নেই বাড়িতে? তোমার মেয়ে তো কেবল খাবে আর ঘুরে বেড়াবে, সে একটু চায়ের কাপটাও এগিয়ে দিতে পারে না?

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

—ও অরবিন্দবাবু, অত অন্যমনস্ক কেন, চেঁচান চেঁচান, ইনক্লাব জিন্দাবাদ! বলুন বলুন, ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

এবার এতক্ষণে একটা কোয়ার্টার পাউন্ড পাঁউরুটি অরবিন্দের হাতের ভেতর কে গুঁজে দিয়ে গেল। আর বেশি দেরি নেই। এবার বড় হোটেলটার কাছে এসে গেছে। হোটেলের দোতলার বারান্দা থেকে সাহেব-মেমরা ঝুঁকে দেখছে।

—বলো ভাই, ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

মিস্টার পারকিনসন এসেছিল সি-এম-পি-ওর কাজে এ্যাডভাইস দিতে। ফরেন এক্সপার্ট, অনেক টাকা মাইনে তার। সব নিয়ে মাসে ষোল হাজার টাকা। ওয়ারের সময় আমেরিকান আর্মির কাজে সাহায্য করেছে। অংক কষে কষে বলে দিত সাহেব, কত পয়েন্টে কামান ছুঁড়লে বোমা কত দূরে গিয়ে পড়বে। অনেক সময় এনিমি'র টার্গেটের ওপর এক-একটা বোমা গিয়ে অব্যর্থ আঘাত দিয়েছে। সবই মিস্টার পারকিনসনের কৃতিত্ব। তাকে ইণ্ডিয়ায় পাঠানো হয়েছে কলকাতার উন্নতি করবার জন্যে। সাহেব এসে এই স্ট্র্যান্ড হোটেলে উঠেছে আর কলকাতার কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছে।

হঠাৎ রাস্তায় গোলমাল শুনে মিস্টার পারকিনসনও বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলে—হোয়া'ট ইজ দ্যাট?

জুডি আর ক্লারা হবসন পাশেই দাঁড়িয়েছিল। জুডি বললে—দ্যাট ইজ দ্যাট—

নিচে থেকে অরবিন্দও দেখলে ওপর দিকে চেয়ে। কেলো-ফটিকও দেখলে। সবাই-ই দেখলে।

অরবিন্দ বললে—ও বেটারা বেশ আছে, না রে কেলো-ফটিক?

কেলো-ফটিক বললে—ওরাই তো এখন ইণ্ডিয়া চালাচ্ছে অরবিন্দবাবু—

—কেন?

অবাক হয়ে গেল অরবিন্দ। ওরা চালাচ্ছে কেন? আমরা তো এখন স্বাধীন হয়ে গেছি। সাহেবরা তো চলে গেছে—

—আরে না। কে আপনাকে বললে সাহেবরা চলে গেছে?

অরবিন্দ বললে—সে কী? সাহেবরা যায়নি?

—না যায়নি। আপনি তো আমাদের পার্টির মীটিং-এ যাননি। সেদিন তো

আমাদের লীডার এসে তাই বলে গেল। পি-এল-৪৮০র নাম শুনেছেন?

—না তো! সেটা আবার কী?

কেলো-ফটিকরা লেখা-পড়া জানে না বটে, চায়ের দোকানে বসে দিনরাত আড্ডা দেয়। কিন্তু খবর রাখে সব। সারা দুনিয়ার হাঁড়ির খবর মুখস্থ। রাশিয়া ইণ্ডিয়াকে 'মিগ' দেবে কিনা, পি-এল-৪৮০ মানে কী, পাকিস্তান আমেরিকার দলে না চায়নার দলে, সব কিছু সে জেনে বসে আছে। এমন ভাবে সে কথাগুলো বলে যেন জনসন কি কোসিগিন কিংবা উইলসন তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে আড্ডা দেয়। সে বলে—ব্রিটিশরা চলে গেলে কী হবে, এখন তো তার জায়গায় আমেরিকা এসেছে—

—কী রকম? কোথায় এসেছে? তাদের তো দেখতে পাই না।

কেলো-ফটিক বলে—ওই তো কায়দা রে, পি-এল-৪৮০র তো ওই কায়দা। জানিস ৫৯৪ কোটি টাকা দেনা আছে আমাদের আমেরিকার কাছে—। আপনার আমার মাথার ওপর সেই দেনা ঝুলছে—

—তোকে কে বললে?

কেলো-ফটিক বললে—ওই যে পাঁউরুটি দিচ্ছে, ও-ই বলেছে—এখন যদি জনসন টাকাটা চেয়ে বসে তাহলেই ইণ্ডিয়া চিত্তির—ওই জন্যেই তো ডি-ভ্যালুয়েশন হলো রে—

এসব জানবার কথা নয় অরবিন্দর। তবু কেলো-ফটিকের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে—তাহলে এখন আমেরিকাই আমাদের কর্তা?

—আরে তাছাড়া কী?

হঠাৎ ওদিক থেকে চিৎকার উঠলো—বলো ভাই, ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

আর সকলের সঙ্গে অরবিন্দও চিৎকার করে উঠল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

জুডি হবসন মিস্টার পারকিনসনের দিকে চেয়ে বললে—লুক লুক—লুক এ্যাট দ্য ফান—

মিস্টার পারকিনসন আমেরিকান আর্মির এক্সপার্ট। গম্ভীর হয়ে সব দেখতে লাগলো। তারপর একটা আমেরিকান সিগ্রেট ধরিয়ে বললে—ইয়েস, দে আর অল কম্যুনিস্টস—

বুধবারিদের নিয়ে তখন টানাটানি পড়ে গেছে। কালিঘাটের ট্রাম-ডিপোর সামনে কালি হালদার বুধবারির পাঁঠাটার গলা টিপে ধরেছে। বললে—ইধার আও, হাম সব কুছ ফয়শলা কর দেঙ্গে—

শিউকিষণ ছড়িদারও কম যায় না। বললে—ভাগ, তু ভাগ ইঁহাসে, ভাগ— ইয়ে হামার দেশ-ওয়ালি ভাই, ইয়ে হামারা যজমান হ্যায়—

কিন্তু শুধু তো তারা নয়। কালিঘাটের পাণ্ডা আরো আছে। প্রতিদিন তারা উপোষী ছারপোকার মত চুপ করে আড়ালে লুকিয়ে থাকে, আর যাত্রী পেলেই তার টুঁটি টিপে রক্ত চোষে। তারাও কোত্থেকে এসে হাজির হলো সশরীরে। তারাও

এসে টানাটানি আরম্ভ করে দিলে।

বুধবারি বললে—ই কেয়া হ্যায় ভাইয়া, কেয়া দিক কর রহা হ্যায়—

বুধবারির বুড়ি মা ভয় পেয়ে গেল। বললে—অ বুধবারি, ই লোগ ক্যায়া কর রহা হ্যায়—

বুধবারির বউ, মেয়ে তারাও হকচকিয়ে গেছে। টানাটানিতে তাদের কাপড়ের গিঁট খুলে যাবার জোগাড়। বুধবারির বউ মেয়েটার হাত ধরে আটকে রাখলে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে না যায়।

আর ওদিকে তখন গোস্বামী ভবানীপুরের একটা সিনেমা হাউসের সামনে গিয়ে বললে—রামধনি, রোখকে—থামো এখানে—

গোস্বামী গাড়ি থেকে নেমে সামনের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে তর-তর করে ওপরে উঠে গিয়ে একটা ফ্ল্যাটের সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগলো।

ফুটো দিয়ে ভালো করে দেখে নিয়ে বেণুদি দরজা খুলে দিলে।

—ওমা, কী খবর গোস্বামী? বলি, এতদিনে মনে পড়লো বেণুদিকে?

গোস্বামী বললে—বা রে বা, তুমি তো বেশ। আমি তোমাকে টেলিফোন করে করে পাই না।

—ওমা, তুমি আবার কবে টেলিফোন করলে আমাকে?

—জিজ্ঞেস করো, তোমার বাড়িতে কে একজন ছিল, সে-ই ফোন ধরেছিল—জিজ্ঞেস করো তাকে—

—আমার বাড়িতে কে আর থাকবে। এক আছে সুসী।

—সুসী কে?

—ওমা, সুসীকে তুমি চেনো না? আমার মেয়ে, বড় ভালো মেয়ে বাবা। যেখানে যাবে একেবারে ঘর আলো করে থাকবে—

গোস্বামী বললে—না না, ঘর আলো করবার দরকার নেই আমার, ঘন্টা দু'একের মামলা, একটা ইমপোর্ট লাইসেন্সের ব্যাপার—

—ইমপোর্ট লাইসেন্স? তাহলে তো বাবা রেট একটু বাড়াতে হবে।

গোস্বামী বললে—রেট নিয়ে গন্ডগোল হবে না। তুমি যা চাও তাই দেব—

বেণুদি বললে—আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখি বাবা, শেষকালে তোমার পার্টি কিছু অভদ্রতা করবে না তো?

—অভদ্রতা মানে?

—এই কিস্-টিস্ খেতে পারবে না। গায়ে হাত দিতেও পারবে না।

গোস্বামী অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী? কিস্ না খেলে চলবে কী করে? আর শুধু কিস্ তো নয়, যদি শুতে চায় আমার পার্টি, তখন আমি কী বলে ঠেকাবো?

বেণুদি যেন সাপ দেখে দশ পা পেছিয়ে এসেছে।

বললে—না না না বাবা, আমার সুসী তো বাজারের মেয়ে নয়। সে-সব তুমি আমার কাছে পাবে না। লক্ষ টাকা দিলেও পাবে না। আমার এখানে শুধু স্টুডেন্ট খদ্দের, সে পেতে গেলে তুমি সোনাগাছিতে যাও বাবা—। আমার সুসী জমি কিনবে, বাড়ি করবে বলে ভাড়া খাটছে দু'দিনের জন্যে, তারপর টাকা জমিয়ে একদিন বিয়ে করবে, ঘর-সংসার করবে। এ হলো ভদ্রঘরের গেরস্থ মেয়ে, আমার কাছে

ও-সব কথা বোল না বাবা—

তা তাই-ই সই।

—এ্যাডভান্স কত লাগবে?

—ক'ঘন্টা আটকে রাখবে আগে বলো?

—এই ধরো ঘন্টা তিনেক—তার বেশি নয়। মাল-টাল খেয়ে আমার পার্টি যখন বেহুঁশ হয়ে পড়বে, তখন আমি নিজে তোমার মেয়েকে তোমার বাড়িতে এনে তুলে দেব।

ঠিক আছে। সেই ব্যবস্থাই হলো। বেণুদি ভেতরের ঘরে গিয়ে বললে—সুসী, মা আমার, লোক এসেছে, চলো—

সুসী বললে—তুমি সব দর-দস্তুর করে দিয়েছ তো বেণুদি—

বেণুদি বললে—হ্যাঁ মা, আমি সব পাকা বন্দোবস্ত করে দিয়েছি, তোমার কোনও ভয় নেই, এও স্টুডেন্ট! তোমাকে তো বলেইছি, আমার এখেনে ব্ল্যাক-মার্কেটারদের কোনও ঠাঁই নেই—আমার সব স্টুডেন্ট খদ্দের--

সুসী সেজে-গুজে তৈরিই ছিল। তবু আয়নাতে মুখখানা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে এল।

রাজভবনের সামনে তখন পুলিশ-পাহারার পাঁচিল উত্তুংগ হয়ে উঠেছে। একটা মাছি যেন না ভেতরে ঢোকে। স্ট্রিক্ট অর্ডার দেওয়া আছে পুলিশ-কমিশনারের। রাইফেল, বন্দুক, টিয়ার-গ্যাস সব রেডি। এতটুকু এগিয়েছ কি, তোমার বুকের মধ্যে বুলেট গিয়ে বিঁধবে। কলকাতা শহরে অনেকদিন পরে কিন্নরকণ্ঠী এম. এস. শুভলক্ষ্মী মাদ্রাজ থেকে এসেছে গান গাইতে। শুভ-লক্ষ্মীর গান শুনে রাজভবনের রাজপুরুষ একটু অশান্তি ভুলতে চান। তাই এবার গায়িকার ডাক পড়েছে এই কলকাতার রাজভবনের অন্তঃপুরে। খাদ্যের অভাব আছে বটে দেশে, তাবলে গান শোনা তো আর বে-আইনী নয়। একটার পর একটা গান গাও শুভলক্ষ্মী। তোমার গানে কলকাতায় প্রাণ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব হোক। শুভ হোক রাজভবনের রাজপুরুষের সিংহাসন। এমন স্বস্তি-বাচন করো যাতে আমার রাজ-সিংহাসন অটল থাকে।

একে একে গান গেয়ে চলেছেন শুভলক্ষ্মী। খেয়াল-ঠুংরি-ভজন।

রাজপুরুষ বললেন—এবার একটা বাংলা গান হোক, শুনেছি আপনি বাংলা গানও গাইতে পারেন—

শুভলক্ষ্মী বাঙলায় গান সুরু করলেন—রবীন্দ্র-সঙ্গীত—

হে নূতন দেখা দিক আরবার
জন্মের পরম শুভক্ষণ!

হঠাৎ যেন মনে হলো বাইরে কাদের চিৎকার সুরু হয়েছে। একটা স্লোগানের

মত। বড় কর্কশ শব্দ ওটা। নূতনের আবির্ভাবের সঙ্গে ওই কর্কশ-শব্দটা কানে বড় বেখাপ্পা লাগলো। তাই পুলিশ-পাহারার দল সচকিত হয়ে উঠলো—হুঁশিয়ার—

একটা হুইশ্‌লের শব্দে সমস্ত এস্‌প্ল্যানেড যেন খান্‌ খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়লো।

—বলো ভাই, ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ!

অরবিন্দ হঠাৎ লক্ষ্য করলে কখন যেন অজান্তে সকলের সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে সে। কেলো-ফটিক কোথায় গেল? আশেপাশে অনেক অচেনা লোক। কাউকেই চিনতে পারলে না সে। তবু কোথা থেকে যেন কে তার সাহস জুগিয়ে দিলে। কে যেন বললে—এগিয়ে চলো অরবিন্দ, এগিয়ে চলো। চিৎকার করো—ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ! দ্বিধা কীসের, সঙ্কোচ কীসের? দেশ তো আমেরিকার হাতে! পাঁচশো চুরোনব্বই কোটি টাকার দেনা। প্রত্যেকের মাথা পিছু আট-হাজার টাকা লোন্‌। তুমিও খয়রাতির মানুষ। তোমার কে আছে যে তুমি এত ভয় পাচ্ছো? তোমার সুসী তো পালিয়েছে, তোমার মা তো অন্ধ, তোমার গোপা তো রুগ্ন। তোমার তো কেউ নেই দুনিয়ায়। তুমি কার জন্যে ভাবছো?

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

—জায়, কালী মাঈকী জায়!

বুধবারির দল যেন স্রোতের মুখে কুটোর মত তখন ভেসে চলেছে মন্দিরের দিকে। বুধবারিকে পেয়ে সবাই যেন একটা খোরাক পেয়েছে। বুধবারিরাই তো মা-কালীর খোরাক। মা-কালীর খোরাক, মা-কালীর পাণ্ডাদের খোরাক, রাশিয়ার খোরাক, আমেরিকারও খোরাক। আবার পি-এল-৪৮০-রও খোরাক। কালি হালদার একদিকে আর একদিকে শিউকিষণ! দু'জনেরই যজমান বুধ-বারিরা। বুধবারিরা আছে বলে তাই ওরা পেট চালাতে পারছে। একজন ইণ্ডিয়ার গলা টিপে ধরেছে, আর একজন পা দুটো। একদিকে আমেরিকা, আর একদিকে রাশিয়া।

মিস্টার পারকিনসন হুইস্কির বোতল নিয়ে তখন চুমুক দিচ্ছে আর কথা বলছে জুডি হবসনের সঙ্গে। ক্যালক্যাটাকে আমরা ইম্‌প্রুভ করবোই। উই মাস্ট্‌!

জুডি হবসন বললো—নো মিস্টার পারকিনসন, ইউ ওন্ট্‌। তুমি পারবে না ইম্‌প্রুভ করতে—

—কেন? হোয়াই?

জুডি হবসন বললে—আমি কথা বলেছি এখানকার সকলের সঙ্গে, ইণ্ডিয়ার ফাইন্যান্স মিনিস্টার তোমাদের ক্যালকাটার উন্নতি করতে দেবে না। তারা বাঙালীকে হেট্‌ করে, বাঙালীর ভালো হোক সেটা কেউ চায় না।

—ইজ্‌ ইট্‌?

জ্বডি বললে—ইয়েস!

—কিন্তু কেন?

—বাঙালীরা যে স্বভাষ বোসের জাত। নেতাজীর জাত। নেতাজীকে একদিন আমরা হেট করেছি। এখন আবার দিল্লীর র্বলিং-পার্টিও বাঙালীদের হেট্ করে—আই পিটি দেম! কিন্তু আই টেল ইউ মিস্টার পারকিনসন্, আমরা নেতাজীকে হেট্ করতুম বটে, কিন্তু প্রেজ্‌ও করি। হি ওয়াজ আওয়ার উইলিয়াম দ্য কনকারার! কিন্তু সেই নেতাজীর বংশধরদের দেখে এখন আমার মায়া হয়! ইয়েস, মায়া হয়। দ্বনিয়ার লোকে আমাদের বলে বেনের জাত, বেনের জাত বলে আমাদের হেট্ করে। কিন্তু মিস্টার পারকিনসন্, তোমরা পি-এল-৪৮০ দিয়ে আজ আমাদেরও হারিয়ে দিলে—

রাজভবনের রাজপ্বর্বষের চোখের তারায় তখন নতুন স্বপ্নের ঘোর লেগেছে।

হে ন্বতন দেখা দিক আরবার
জন্মের পরম শ্বভক্ষণ!

আর পার্ক স্ট্রীটের গ্রীণ গ্রোভের ভেতরে একটা কেবিনের অন্ধকারে বসে এস-কে-বাগচি তখন কিপলেক্স-গ্লাসের ইমপোর্ট-লাইসেন্স্ নিয়ে পাকা দলিল বানাচ্ছে। ব্ল্যাক-ডগ্ হ্বইস্কির কড়া মেজাজ, আর তার সঙ্গে আরো কড়া মেজাজের মেয়েমান্বষ স্বসী। স্বসী জমি কিনবে, বাড়ি করবে, তারপর বিয়ে করবে, সংসার করবে। স্বসীর জীবনের ইমপোর্ট লাইসেন্স্ পাইয়ে দেবে এস-কে-বাগচি। এস-কে-বাগচির কোলের ওপর বসে স্বসী সেই কথাই বলছিল তখন।

হঠাৎ গোস্বামী বললে—স্যার, স্বসীকে যেন কিস্-টিস্ করবেন না, বেণ্বদি মানা করে দিয়েছে—

—ইউ, ব্ল্যাডি ব্যাসটার্ড, সন্ অব্ এ বীচ্—

ব্ল্যাক-ডগ্-এর মেজাজ তখন এস-কে-বাগচির মাথার রগে গিয়ে ঠেকেছে। মাত্রার ঠিক নেই আর তখন। গেট্ আউট্, গেট্ আউট্ ফ্রম হিয়ার, উইল ইউ?

—না স্যার, আমি কথা দিয়েছি বেণ্বদিকে, কিস্ খেতে পারবেন না, গায়ে হাত দিতে পারবেন না। ওর সঙ্গে শ্বতে পারবেন না—

এস-কে-বাগচি চিৎকার করে উঠলো—আমি কিপলেক্স-গ্লাস ইমপোর্ট-লাইসেন্সের মালিক, আই এ্যাম্ দ্য মনার্ক্, ইউ গো ট্ব হেল—

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

অরবিন্দ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে। কোয়ার্টার পাউন্ড পাঁউর্বটিটা বাঁ-দিকের পকেটে রয়েছে। আর একটা পকেটে রয়েছে বাজারের থলি। দিলীপদা'র কাছ থেকে টাকা হাওলাত্ নিয়ে হাফ-কিলো মাংস কিনতে বেরিয়েছিল। সে-সকাল বেলার ব্যাপার। তারপর অনেক স্বর্য অনেক পথ পরিক্রম করে আরো অনেক দ্বরে অস্ত গেছে। সন্ধ্যে নেমে এসেছে রাজপ্বর্বষের রাজভবনের অন্তঃপ্বরে। শ্বভলক্ষ্মী মাদ্রাজ থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে গান গাইতে এসেছেন। আবার

নূতন দেখা দিক নতুন করে, আবার জন্মের পরম শুভক্ষণের আবির্ভাব হোক। তখন আবার নতুন করে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। সেদিন এই মিছিল থাকবে না, এই স্লোগ্যান থাকবে না। সেদিন শুধু তোমার গান শুনবো এখানে বসে বসে শুভলক্ষ্মী। তুমি গাইবে আর আমি শুনবো। তখন পি-এল-৪৮০-র লোন্ শোধ হয়ে যাবে কড়ায়-গণ্ডায়-ক্রান্তিতে। সেদিন সি-এম-পি-ও এই কলকাতাকে আবার নতুন করে গড়ে তুলবে। সেদিন সবাই সস্তায় দু' কিলো করে চাল পাবে সপ্তাহে, চিনি পাবে, গম পাবে। সেদিন আর ভাতের বদলে আলু খেতে বলবো না তোমাদের, কাঁচকলা খেতেও বলবো না। সেদিন তোমাদের সন্দেশ খাওয়াবো, রসগোল্লা খাওয়াবো, রাজভোগ খাওয়াবো, রাবড়িও খাওয়াবো। সেদিন মাংস খাইয়ে তোমার গোপাকে মোটা করে দেব, তোমার মায়ের চোখ সারিয়ে চশমা করিয়ে দেব। সেদিন সুরমাকে গাড়ি চড়িয়ে কলকাতা দেখাবো, নিরঞ্জনকে ডক্টরেট পাইয়ে দেব। সেদিন সার্কুলার রেল করে দেব, সেদিন সকলের ঘরে ঘরে জল দেব, সকলকে বাড়ি দেব, আশ্রয় দেব, বাসে-ট্রামে বসবার বন্দোবস্ত করে দেব।

কথাগুলো শুনে রাজপুরুষের অন্তঃপুরের সামনে হঠাৎ এক-চক্ষু কামানটা একটা কটাক্ষ করে উঠলো।

ও কামান আজকের নয়। বহুদিন আগে বাঙলার গভর্নর জেনারেল এডওয়ার্ড লর্ড এলেনবরা ওইখানে ওই কামানটা বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তোমাদের জন্যে। ১৮৪৩ সালে একদিন চীনেদের হারিয়ে ওইখানে ওই চীনে-কামানটা বসিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। ১৯৪৭ সালে আমরা চলে গিয়েছিলাম ইন্ডিয়া ছেড়ে কিন্তু ওটাকে রেখে দিয়ে গিয়েছি তোমাদের জন্যে। আমরা জানতুম একদিন তোমরা ওই রাজভবনের সামনে এসে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করবে—আর তোমাদের দিকে তাগ্ করে বুলেট ছুঁড়বে আমার প্রেতাত্মা।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

অরবিন্দ আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলো। ওদিকে বুধবারির পাঁঠাটাও আরো জোরে আর্তনাদ করে উঠলো।

—জায় কালী মাঈকী জায়!

সুসী বললে—আমাকে তুমি জমি কিনে দেবে? বাড়ি করে দেবে মিস্টার বাগচি?

গোস্বামী বললে—ও কী করছেন স্যার?. চুমু খাচ্ছেন কেন? গায়ে হাত দিতে বারণ করেছিল যে বেণুদি, গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? আমি কিন্তু স্যার দায়িত্ব নেব না আর—

হঠাৎ ভীড়ের হুড়োহুড়িতে অরবিন্দর পকেটের কোয়ার্টার পাউন্ড পাঁউরুটিটা পকেট থেকে পড়ে গেছে। কে যেন তুলে নিচ্ছিল। পাশ ফিরেই দেখলে একটা পুলিশ. পাঁউরুটিটা কুড়িয়ে নিচ্ছে। আর থাকতে পারলে না। এক লাফে অরবিন্দ পুলিশটার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এক-চক্ষু কামানটা আবার কটাক্ষ করে উঠলো।

হে নূতন দেখা দিক আরবার
জন্মের পরম শুভক্ষণ!

হঠাৎ রাজপুরুষ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সুর কাটলো কেন? তাল কাটলো কেন? বাইরে কারা ডিসটার্ব করছে?

এক-চক্ষু কামানটা হঠাৎ আবার একশো বছর পরে সজোরে গর্জন করে উঠলো। আর অরবিন্দর হাত থেকে কোয়ার্টার-পাউন্ড পাঁউরুটিটা খসে পড়লো এক মুহূর্তে। আর তার সেটা তুলে নেবার ক্ষমতা রইল না। একটা নির্বাক দৃষ্টি দিয়ে সেই পাঁউরুটিটার দিকেই অরবিন্দ চেয়ে রইল।

আর কামারের খাঁড়ার ঘা লেগে কালীমন্দিরের উঠোনের হাড়িকাঠে বুধবারির পাঁঠাটার মুন্ডুটা খসে গিয়ে পড়লো দশ হাত দূরে। একেবারে ঘাড় পেঁচিয়ে কাটা হয়েছে। এক মুহূর্ত শুধু। একটু নেচে উঠলো মুন্ডুটার দু'চোখের তারা দুটো। তারপর সব স্থির। আর ওদিকে রাজভবনের সামনে অরবিন্দর নিশ্চল চোখ দুটোও শুধু সেই চীনে কামানের দিকে বোবা হয়ে চেয়ে রইল। আর কথা বলতে পারলো না।

রাজভবনের রাজ-অন্তঃপুরে তখন শুভলক্ষ্মীর গানের প্রথম-কলি দু'টো বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

হে নূতন দেখা দিক আর বার...

সুসীও তখন একেবারে অচৈতন্য। ব্ল্যাক ডগ্ বুঝি হোয়াইট-ডগকেও হারিয়ে দিলে। কিপলেক্স-গ্লাসের ইমপোর্ট-লাইসেন্স নিয়ে শিরীষবাবুরা আর একটা পাঁঠা সদ্য বলি দিলে গ্রীণ-গ্রোভের হাড়িকাঠে।

অরবিন্দ, সুসী, আর বুধবারির পাঁঠাটা তিনজনেই সেদিন একসঙ্গে নিথর নিশ্চল হয়ে বোবা দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রইল কলকাতার দিকে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

এয়ার-পোর্টে তখন মিস্টার পারকিনসন প্লেন ছাড়বার আগে প্রেস-কনফারেন্স বসিয়েছে। সমস্ত নিউজ্ পেপারের স্টাফ-রিপোর্টার গিয়ে হাজির হয়েছে সেখানে। আজ একটা খুব আনন্দের খবর দেবার আছে আপনাদের। আমরা পি-এল-৪৮০-র টাকা দিয়ে ক্যালকাটা ইমপ্রুভ করবো। আমাদের প্ল্যান কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর টেন ইয়ার্সের মধ্যে আপনারা কলকাতায় প্রচুর জল পাবেন, হাওয়া পাবেন, সারকুলার রেল পাবেন। মানুষের মত বাঁচবার জন্যে যা কিছু উপকরণ দরকার সব পাবেন। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের প্ল্যান সাকসেসফুল।

খানিক পরেই আমেরিকান এক্সপার্টকে দিয়ে জেট্-প্লেন আকাশে গিয়ে উঠলো।

আর আকাশের নিচে মাটির পৃথিবীতে তখন রাজভবনের সামনে আবার আর এক দল মাটির মানুষ চিৎকার করে উঠলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! আর একজন সুসী আর একজন এস-কে-বাগচির কোলে মাথা রেখে বলতে লাগলো—তুমি আমাকে জমি কিনে দেবে মিস্টার বাগচি? তুমি আমাকে একটা বাড়ি করে দেবে? আর, আর একজন বুধবারি কালী মন্দিরে আর একটা পাঁঠা নিয়ে এসে আর এক-

বার হাড়িকাঠে চড়িয়ে দিলে। আর একবার চিৎকার উঠলো—কালী মাঈকী জায়!

আর, রাজভবনের ভেতর থেকে রাজপুরুষের কানে আর একজন শুভলক্ষ্মীর গান আর একবার ভেসে আসতে লাগলো—হে নূতন দেখা দিক আরবার, জন্মের পরম শুভক্ষণ।

—